ভারত নারী

জনশিক্ষা গ্রন্থমালা-৭

ভারত নারী

উপনিষদের গল্প, পল্লী-গীতি কাব্য-কথা,
ভাগবতের গল্প প্রভৃতি প্রণেতা

সুবোধচন্দ্র মজুমদার
প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

জুন
১৯৮৫
৮

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

দাম—
টা. ৩.০০

উপহার

সূচীপত্র

'দীর্ঘকাল ধরে আমরা বাংলার শিক্ষা ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে নূতন নূতন অভিযান চালিয়ে আসছি, তাতে যুক্ত হলো একটা নূতনতর প্রচেষ্টা।'

স্বল্পশিক্ষিতের দেশে উপরতলার পাঠকদের রুচি আর মন যুগিয়ে চলবার তাগিদ আর যারই থাক, আমরা কিন্তু চিরকালই সাহিত্যের পংক্তিভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলার সর্বসাধারণকে। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত— সবাই যাতে সহজলভ্য জ্ঞানের আলোকে তাঁদের অন্তরলোককে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারেন, সে দিকেই ছিল আমাদের লক্ষ্য। ঐ সাধু উদ্দেশ্যের তাগিদেই আমাদের পূর্বতন প্রচেষ্টার সঙ্গে এবার যোগ করছি সদ্য-প্রকাশিত 'জনশিক্ষা গ্রন্থমালা'।

বাইরের জগতের প্রভাব ও শিক্ষাসংস্কৃতি থেকে নিজেদের বঞ্চিত না করেও দেশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও ভাবধারার উপর নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার কল্পনা মোটেই অবাস্তব নয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা 'জনশিক্ষা গ্রন্থমালা'-পর্যায়ে যে ধরনের বই প্রকাশ করছি, তার বেশির ভাগই আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, গল্পকাহিনী কিংবা লোকশিক্ষাকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে।

কত যুগ পরে অবহেলিত জনসাধারণের প্রতি দৃষ্টি পড়েছে সরকারের। জনশিক্ষায় উদ্যোগী হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই অনুকূল পরিবেশে আমরাও সরকারী প্রচেষ্টায় সহায়তা করে অশিক্ষার অভিশাপ দূর করতে সচেষ্ট হয়েছি।

যাঁদের জন্যে আমাদের এই প্রচেষ্টা তাঁরা উপকৃত হ'লেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। ইতি—

বিনীত

প্রকাশক

ভূমিকা

নারীদের স্থান আজ আর শুধু অন্তঃপুরে নয়, ঘরে বাইরে সকল কাজে নারী এসে দাঁড়িয়েছেন পুরুষের পাশে। সেকালের সমাজেও নারীর স্থান এমনি ছিল। দানে-ধর্মে, কিংবা শাসন-কার্যেও ভারতের নারী বিদেশের নারীদের চেয়ে কোন অংশে হীন নহেন, তারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল এ বইয়ে। এ দৃষ্টান্তগুলো দেখে পুরুষ নারীর উপযুক্ত মর্যাদা দিতে শিখবেন, আর নারী পাবেন প্রেরণা।

ইতি—

সুবোধচন্দ্র মজুমদার

দিল্লীর সিংহাসনে বসে তখন ভারত শাসন করছেন সম্রাট্ অনঙ্গপাল। সম্রাট্ বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন — তাই রাজ্যের লোকেরা ভাবছে, তাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট্ হবেন কে? বৃদ্ধ সম্রাটের কোন পুত্র-সন্তান নেই —শুধু দুই কন্যা। কন্যাদের আবার একটি করে পুত্র— একজন জয়চন্দ্র, অপরজন পৃথ্বীরাজ। এঁদের মধ্যে বয়সে জয়চন্দ্র বড় হলেও গুণে-জ্ঞানে ও শক্তিতে পৃথ্বীরাজই শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

বৃদ্ধ অনঙ্গপালের ইচ্ছা ছিল—জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তাকে যেন পৃথ্বীরাজের সঙ্গেই বিয়ে দেওয়া হয়। জয়চন্দ্রেরও তাতে কোন আপত্তি ছিল না। কারণ তিনি ভেবেছিলেন বৃদ্ধ মাতামহের মৃত্যুর পর তিনিই সম্রাট্ হবেন। তখন পৃথ্বীরাজের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিলে সব কাজেই পৃথ্বীরাজ তাঁকে সাহায্য করবেন। নতুবা সিংহাসনের লোভে হয়তো পৃথ্বীরাজ তাঁর শত্রুতা করতে পারেন। তাই, একদিকে মাতামহের ইচ্ছাপূরণ ও অপরদিকে তাঁর স্বার্থসাধন—দুই ভেবে জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজকে কথা দিয়েছিলেন যে তাঁর হাতেই তিনি সংযুক্তাকে দান করবেন।

সংযুক্তা পৃথ্বীরাজের বাগ্‌দত্তা—তাই তিনি পৃথ্বীরাজকেই মনে মনে স্বামী বলে মেনে নিয়েছিলেন। রাজ্যশুদ্ধ লোকও এই কথাই জানত।

কিন্তু হঠাৎ কাঁটা ঘুরে গেল। মৃত্যুকালে অনেক ভেবে-চিন্তে সম্রাট্ অনঙ্গপাল পৃথ্বীরাজকেই দিল্লীর সিংহাসন দিয়ে যান—আর জয়চন্দ্রকে করে যান কনৌজের রাজা।

জয়চন্দ্র মনে ভীষণ আঘাত পেলেন—কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে চলে গেলেন কনৌজে। পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সিংহাসনে বসে ভারত শাসন করতে লাগলেন।

কনৌজে এসে ধীরে ধীরে জয়চন্দ্র যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। এ সময়ে তাঁর সঙ্গে জুটল কুচক্রী মোসাহেবের দল—যারা দিনরাত তাঁকে পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে উসকিয়ে দিতে লাগল। তারা বলল :

আপনারা দুজনেই সম্রাট্ অনঙ্গপালের দৌহিত্র—আর আপনিই বড়, কাজেই ন্যায়তঃ, ধর্মতঃ দিল্লীর সিংহাসন আপনারই পাওয়া উচিত। আর তাছাড়া পৃথ্বীরাজের চেয়ে আপনি ছোট কিসে? আপনার ন্যায্য সম্পত্তি আপনি জোর করে আদায় করে নিন।

কিন্তু মোসাহেবরা যাই বলুক, জয়চন্দ্র নিজে জানতেন যে জোর করে তিনি

কোনদিনই পৃথ্বীরাজকে হটাতে পারবেন না। কাজেই সে চিন্তা বাদ দিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন, কী উপায়ে পৃথ্বীরাজকে অপদস্থ করা যায়।

কুচক্রী মন্ত্রী আর মোসাহেবদের সঙ্গে বসে কেবল তারই জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল। শেষটায় স্থির হল যে তিনি ভারতের সব রাজাদের ডেকে রাজসূয় যজ্ঞ করবেন—সেখানে সব রাজাই যদি তাঁকে সম্রাট্ বলে মেনে নেন, তবেই তিনি ভারত-সম্রাট্ হতে পারেন।

তখন একজন কথা তুলল :

দিল্লীতে যখন একজন সম্রাট্ রয়েছেন, তখন রাজসূয় যজ্ঞের কথা বললে কোন রাজাই আসতে সাহস পাবেন না। কাজেই তার আয়োজন করা চলবে না।

অনেক ভেবে ভেবে অন্য উপায় ঠিক করা হল। রাজসূয় যজ্ঞের কথা না বলে যদি অন্যভাবে রাজাদের নিমন্ত্রণ করে আনা যায়, তা হলেই তো হয়ে যায়। আর জয়চন্দ্রকে তাঁরা শুধু সম্রাট্ বলে স্বীকার করবেন—কর কিংবা উপঢৌকন দিতে হবে না। যদি তাঁদের একথা বলা হয়, তবে বোধ হয় কেউ আর আপত্তি করবেন না।

কিন্তু কী বলে তাঁদের নিমন্ত্রণ করা যায়? কেউ কেউ বললেন—জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তা স্বয়ংবরা হবেন, যদি এ কথা ঘোষণা করা হয়, তাহলে সব রাজা কনৌজে আসবেন। আর তখনই রাজসূয় যজ্ঞটা সেরে নিলে হবে।

কিন্তু সংযুক্তা যে বাগ্‌দত্তা—তার কি হবে?

এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন জয়চন্দ্র নিজেই। তিনি বললেন :

মাতামহ যদি আমায় সম্রাট্ করতেন, তবেই এ কথার মূল্য থাকত—তিনি যখন ঠিক কাজ করেন নি, তখন আমিও আমার কথা ফিরিয়ে নেব। পৃথ্বীরাজ আমার পরম শত্রু—মরে গেলেও আমি তাঁর হাতে কন্যা দেব না।

তারপর জয়চন্দ্র আরও একটা প্রস্তাব করলেন :

ভারতের সব রাজাকে আমন্ত্রণ জানাব। জানাব না শুধু শয়তান ঐ

পৃথ্বীরাজকে আর তাঁর ভগ্নীপতি রাণা সংগ্রাম সিংহকে। আর ও-দুজনের দুটো পাথরের মূর্তি গড়িয়ে দরোয়ানের বেশে স্বয়ংবরসভার দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখব—তাহলেই চরম অপমান করা হবে।

কথাটা মোসাহেবদের খুবই ভালো লাগল—তারাও জয়চন্দ্রের কথায় সায় দিল।

সংযুক্তা স্বয়ংবরা হবেন—দেশে দেশে রাজাদের কাছে খবর পাঠানো হল।

খবর শুনলেন সংযুক্তা নিজেও। তিনি পৃথ্বীরাজকেই স্বামী বলে জানেন। তাঁকেই মনপ্রাণ দান করেছেন। কাজেই অন্য কাউকেই আর স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারেন না। অথচ এদিকে পিতার আদেশ—পৃথ্বীরাজ ছাড়া অন্য যাকে খুশী তাঁকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে হবে। এ অবস্থায় সংযুক্তা বুঝে উঠতে পারছেন না—কি করবেন! তিনি ভারী বিপদে পড়ে গেলেন। ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে হল হয়তো পৃথ্বীরাজও স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত থাকবেন।

গুপ্তচরের মুখে সংযুক্তার স্বয়ংবরের খবর শুনলেন পৃথ্বীরাজ। এ ছাড়া তাঁকে আর সংগ্রাম সিংহকে অপমান করবার উদ্দেশ্যে স্বয়ংবরসভার দরজায় দরোয়ানের মতো তাঁদের পাথরের মূর্তি দাঁড় করিয়ে রাখবেন এ কথাও তাঁর কানে গেল। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। হয়তো ভাবলেন, দেখা যাক কি হয়।

ভারতের নানা রাজ্য থেকে রাজারা এসে উপস্থিত হলেন কনৌজে—সংযুক্তার স্বয়ংবরসভায় যোগদানের জন্যে। শুধু এলেন না দিল্লীর সম্রাট্ পৃথ্বীরাজ আর মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ। কারণ তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয় নি।

সভা করে সবাই বসেছেন—সংযুক্তাকে নিয়ে আসা হল সভায়। সংযুক্তা এক একজন রাজার কাছে যাচ্ছেন আর ভাটরা সেই সেই রাজার পরিচয় এবং গুণের কথা বর্ণনা করছেন। কিন্তু কাউকে যেন পছন্দ হচ্ছে না সংযুক্তার। যাঁকে তাঁর পছন্দ হবে, তেমনটি তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না যেন সভার মধ্যে।

রাজারা সব সংযুক্তার দিকে তাকিয়ে আছেন, আর ভাবছেন, কোন্

ভাগ্যবানের গলায় মালা দেবে সংযুক্তা সুন্দরী। কিন্তু কারো গলায় মালা পড়ল না—সংযুক্তা ঘুরে ঘুরে এসে দাঁড়ালেন সভার দরজায়। সেখানেই ছিল পৃথীরাজের মূর্তি।

অবাক্ হয়ে সংযুক্তা সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। চারণকবি পৃথ্বীরাজের গুণগান আরম্ভ করল, আর সংযুক্তা তাঁর বরমাল্য তুলে দিলেন পাথরের মূর্তি ঐ পৃথ্বীরাজের গলায়।

এতক্ষণে যেন ব্যাপারটা সবাই বুঝতে পারলেন। পৃথ্বীরাজের মূর্তির গলায় মালা দিতে দেখে তেড়ে এলেন জয়চন্দ্র নিজে। এমন কন্যা বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। খাপ থেকে তলোয়ার খুলে তিনি ছুটে এলেন কেটে ফেলবেন সংযুক্তার মাথা।

সহসা যেন ভোজবাজি ঘটে গেল—পাথরের মূর্তি যেন মানুষ হয়ে গেল! সভাশুদ্ধ লোক অবাক্ হয়ে দেখল—পাথরের মূর্তির পাশ থেকে পৃথ্বীরাজ বাঁ হাতে সংযুক্তাকে জড়িয়ে ধরে ডান হাতে জয়চন্দ্রকে রুখছেন।

চোখ মুছে সবাই দেখল—নাঃ, চোখের ভুল নয়। সত্যি এ পৃথ্বীরাজ—পাথরের মূর্তির পাশেই দাঁড়িয়ে জীবন্ত পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বীরাজ আগেভাগেই এসে ঐ পাথরের মূর্তির আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন। যখন দেখলেন, জয়চন্দ্র এগিয়ে আসছেন সংযুক্তাকে কেটে ফেলতে, তখনই তিনি সামনে বেরিয়ে এলেন তাঁকে রক্ষা করতে।

জয়চন্দ্র তখন সমস্ত রাজাদের ডেকে বলছেন, পৃথ্বীরাজকে হত্যা করে সংযুক্তাকে ছিনিয়ে নিতে। জয়চন্দ্রের কথায় রাজারাও সব এগিয়ে আসছেন একে একে। একা পৃথ্বীরাজ তাঁদের সামলাচ্ছেন। এদিকে পৃথ্বীরাজের রক্ষী তাঁর ঘোড়া নিয়ে এল।

সংযুক্তা রাজার মেয়ে—ছেলেবেলা থেকেই ঘোড়ায় চড়া, অস্ত্র-চালানো প্রভৃতি বিদ্যায় নিপুণ হয়ে উঠেছিলেন। রক্ষীর হাতে ঘোড়া দেখে তিনি লাফ দিয়ে

চড়ে বসলেন তাতে। পৃথ্বীরাজও চড়ে বসলেন তাঁর পিছনে। ঘোড়া তীরবেগে ছুটে চলল।

পৃথ্বীরাজ এলেন সংযুক্তাকে রক্ষা করতে [পৃঃ ১১

এতক্ষণে রাজারাও সব একজোটে হৈ হৈ করে তেড়ে এলেন। একটু দূরেই পৃথ্বীরাজের সৈন্যরাও ছিল। সুযোগ বুঝে তারাও সব বেরিয়ে এল—দুপক্ষে বেধে গেল যুদ্ধ।

সেই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ জয়ী হয়ে সংযুক্তাকে নিয়ে ফিরে এলেন দিল্লীতে। তারপর খুব জাঁকজমকের সঙ্গে পৃথ্বীরাজ বিয়ে করলেন সংযুক্তাকে। সংযুক্তা হলেন দিল্লীর রানী।

পৃথ্বীরাজ ভাবলেন—কিছুদিন গেলেই জয়চন্দ্রের রাগ পড়ে যাবে—তখন তিনি সংযুক্তাকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসবেন। কারণ দেশের তখন বড় দুর্দিন—বাইরে থেকে কিছুকাল পর পর শত্রুরা এসে আক্রমণ করছিল, তার মধ্যে আবার দেশের ভিতরেও শত্রু রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

অনেক দিন ধরেই তুর্কী মুসলমানরা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এসে ভারতবর্ষের এক এক স্থানে হানা দিয়ে লুটপাট করে ফিরে যেত। এবারও শোনা গেল—গজনীর সুলতান, মহম্মদ ঘোরীকে সেনাপতি করে যুদ্ধে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু গুপ্তচরের মুখে পৃথ্বীরাজ শুনতে পেলেন—তুর্কীরা এবার আর লুটপাট করে ফিরে যাবে না, তারা রাজ্য দখল করে এখানেই থেকে যাবে। ভারতবর্ষ তখন অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত। পৃথ্বীরাজ দেখলেন—তাঁরা যদি একজোটে তুর্কীদের বাধা না দিতে পারেন, তবে তুর্কীরা একে একে সব রাজ্যই দখল করে বসবে। ফলে ভারতে আর হিন্দুরাজ্য একটিও থাকবে না—তার পরিবর্তে সারা দেশে মুসলমানই হবে রাজা।

এই দুঃসময়ে পৃথ্বীরাজ দেশের ছোট বড় সব রাজাকে পত্র লিখে পাঠালেন। তাঁদের অনেকেই বিপদ বুঝে পৃথ্বীরাজের সাহায্যের জন্য সৈন্য পাঠালেন। যে দুই একজন সৈন্য পাঠালেন না—তাঁদের মধ্যে একজন কনৌজের রাজা জয়চন্দ্র।

তিনি ভাবছিলেন, তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধে যদি পৃথ্বীরাজ হেরে যান, তবেই তাঁর অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া হবে। তারপর তুর্কীরা লুটপাট করে চলে গেলে তিনি তখন দিল্লী আক্রমণ করে সিংহাসন দখল করবেন। তখন পৃথ্বীরাজ

কিছুতেই তাঁর সঙ্গে পেরে উঠবেন না। এই মতলব নিয়ে তিনি কনৌজের সীমান্তে সৈন্য সাজিয়ে রাখলেন।

ওদিকে মহম্মদ ঘোরী, কুতুবউদ্দিন ও বক্তিয়ার খিলজীকে সঙ্গে নিয়ে তরাইনে শিবির স্থাপন করে দিল্লী আক্রমণের আয়োজন উদ্যোগ করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে অন্যান্য হিন্দুরাজাদের সহায়তা নিয়ে পৃথ্বীরাজ ও সংগ্রাম সিংহ মহম্মদ ঘোরীর সৈন্যদলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পৃথ্বীরাজের রানী সংযুক্তাও যোদ্ধার বেশে ঘোড়ায় চড়ে তলোয়ার হাতে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

সেই যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরী পরাজিত হলেন। শোনা যায়, তিনি নাকি বন্দীও হয়েছিলেন। আর কখনও এদেশে আসবেন না, এই শপথ করলে সংগ্রাম সিংহ তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তুর্কী সৈন্যরা পরাজিত হয়ে গজনীতে ফিরে গেল। পৃথ্বীরাজের সৈন্যদল যুদ্ধে জয়ী হয়ে আনন্দধ্বনি করতে করতে দিল্লীতে ফিরে এল।

এদিকে জয়চন্দ্র সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন, পৃথ্বীরাজ জয়ী হয়ে দিল্লী ফিরে এসেছেন, তখন তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন। সৈন্যদের নিয়ে সীমান্ত থেকে চুপি চুপি ফিরে এলেন নিজ রাজধানীতে।

বিপদ কাটিয়ে পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তা দিল্লীতে ফিরে এসেও কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলেন না। সংযুক্তা নিজেই এক নারী-বাহিনী তৈরী করলেন এবং তাদের যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে লাগলেন।

কিছুদিন নির্বিবাদে কাটল। কিন্তু পরের বছরই ঘোরী আবার সৈন্যদল নিয়ে দিল্লী আক্রমণের তোড়জোড় করতে লাগলেন।

খবর পেয়ে এবারও পৃথ্বীরাজ হিন্দু রাজাদের সহায়তা চেয়ে পাঠালেন। এবার কিন্তু সবার আগে এলেন জয়চন্দ্র। তিনি বললেন :

আমিই এবার তুর্কীদের প্রথম আক্রমণ করব।

জয়চন্দ্রের মনের পরিবর্তন হয়েছে ভেবে পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তা খুবই খুশী হলেন। ভাবলেন—এবার আর চিন্তা নেই। নিজেদের মধ্যে যদি ঝগড়া বিবাদ না থাকে, তবে বাইরের শত্রুরা কিছুই করতে পারবে না। তাই এবার তাঁরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে রইলেন।

থানেশ্বরের বিরাট মাঠের দুই দিকে দুই পক্ষের সৈন্য অপেক্ষা করছে। যুদ্ধ বাধলে জয়চন্দ্রের সঙ্গেই প্রথম দেখা হবে তুর্কীদের।

মহম্মদ ঘোরীকে প্রথমবার সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল—এবারও পৃথ্বীরাজ তাঁকে চিঠি দিয়ে সাবধান করলেন। তখন মহম্মদ ঘোরী খবর পাঠালেন যে তিনি যুদ্ধ করবেন না। তাঁকে কিছু সময় দিলে তিনি সৈন্যদল নিয়ে ফিরে যেতে পারেন।

জয়চন্দ্রও তাঁর কথায় সায় দিলেন। তিনি বললেন :

বৃথা সৈন্যক্ষয় করে লাভ নেই, যদি ওরা সময় পেলে ফিরে যেতে রাজী হয়, তবে তাদের সময়ই দেওয়া হোক।

পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরীকে ফিরে যাবার জন্যে সময় দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রইলেন।

মাঝ রাত্রি—দিল্লীর সৈন্যদল নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে। জয়চন্দ্র তখন নিজে ঘোরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দিনকে পথ দেখিয়ে দিলেন। কুতুবউদ্দিন সৈন্যদল নিয়ে কনৌজের সৈন্যদলের মধ্য দিয়ে পথ করে দিল্লীর শিবির আক্রমণ করলেন।

দিল্লীর সৈন্যদল তৈরী ছিল না। জয়চন্দ্র যে এই রকম বিশ্বাসঘাতকতা করবেন, তা কেউই ভাবতে পারেন নি। হঠাৎ আক্রমণে পৃথ্বীরাজ এবং রাণা

সংগ্রাম সিংহ উভয়েই নিহত হলেন। কুতুবউদ্দিন অনায়াসে দিল্লী অধিকার করলেন।

সংযুক্তা বুঝলেন, এ অবস্থায় বেঁচে থেকে লাভ নেই। বীর রমণী তিনি—বীরের মতোই স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দিলেন।

প্রতিহিংসাপরায়ণ জয়চন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতায় ভারতে মুসলমান-শাসন শুরু হল। কিন্তু তিনি দিল্লীর সিংহাসন পেলেন না। কুতুবউদ্দীন জয়চন্দ্রকে হত্যা করে কনৌজ দখল করলেন।

সংযুক্তা দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজার মহিষী। তিনি বহুকাল আগে মারা গেলেও ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম আজো অমর হয়ে আছে।

সে অনেক কাল আগের কথা। প্রায় সাত শ বছর আগে—পাঠান সম্রাট্ আলাউদ্দিন তখন দিল্লীর সিংহাসনে বসে ভারত শাসন করছেন। সম্রাট্ আলাউদ্দিন ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর, লোভী ও পরধর্মবিদ্বেষী। তাঁর খুড়ো জালালুদ্দিন ছিলেন ভারতের সম্রাট্। আলাউদ্দিন চক্রান্ত করে তাঁকে হত্যা করে নিজে সম্রাট্ হয়েছিলেন। সম্রাট্ হবার পরই তাঁর মনে হল—দেশ জয় করে রাজ্য বাড়াতে হবে।

তারপর যুদ্ধ করে ছোটখাটো কয়েকটি দেশও জয় করলেন। গুজরাট জয় করে সেখানকার রানী কমলাদেবীকে বন্দিনী করে নিয়ে এসে তাঁকেই করলেন প্রধান বেগম। কিন্তু বেগম তাঁর মোটে একটি ছিল না—হারেম ভরতি ছিল

বেগমে। তবু তাঁর তৃপ্তি নেই, যেখানে যত সুন্দরী মেয়ের কথা শোনেন, তাকেই তিনি হারেমে নিয়ে আসেন, এইভাবে হারেমে তাঁর শতাধিক বেগম হয়ে গেল।

তারপর একদিন আলাউদ্দিন শুনলেন যে চিতোরের রানা লক্ষ্মণসিংহের খুড়ো ভীমসিংহের পত্নী অপূর্ব সুন্দরী—তাঁর মতো সুন্দরী সারা হিন্দুস্থানে নেই। শুনেই তাঁর লোভ হল। তিনি ভাবলেন: পদ্মিনীকে না পেলে আমার হারেমের শোভাই বাড়বে না—কাজেই পদ্মিনীকে চাই-ই।

আলাউদ্দিন দিল্লীর সম্রাট্ হলেও সমস্ত ভারত তখনও তাঁর অধীন হয় নি। রাজপুতানার অনেকগুলি রাজ্য ছিল স্বাধীন। তেমনি একটি স্বাধীন রাজ্য মেবার, আর তার রাজধানী চিতোর। কাজেই আলাউদ্দিন চাইলেই পদ্মিনীকে পাওয়া তাঁর পক্ষে অত সহজ ছিল না।

তবু আলাউদ্দিন ভাবলেন: আমি যখন ভারতের সুলতান, তখন আমার আদেশ অমান্য করবার সাহস কারুর নাই।

তাই আলাউদ্দিন এক জবরদস্ত চিঠি দিয়ে দূত পাঠালেন চিতোরে।

চিতোরের দরবারে বসে আছেন রানা লক্ষ্মণসিংহ, রানা ভীমসিংহ, মন্ত্রী, সেনাপতি আর পাত্রমিত্রগণ। এমন সময় আলাউদ্দিনের চিঠি নিয়ে দূত এসে হাজির হল চিতোর-দরবারে। দিল্লী থেকে চিঠি নিয়ে এসেছে শুনেই রানা আগ্রহের সঙ্গে চিঠি খুলে পড়লেন। চিঠিতে লেখা ছিল:

'আমার পত্র পাবার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মিনীকে দিল্লীতে আমার হারেমে পাঠিয়ে দিতে হবে। নইলে সমস্ত চিতোর পুড়িয়ে ছারখার করে দেব।'

চিঠি পড়েই রানার মুখ অপমানে লাল হয়ে উঠল।

রানা দূতকে বলে দিলেন:

'তোমাদের সুলতানকে বলো যে মেবার তার খাস তালুক নয়—তার ইচ্ছে মতো আমরা চলতে রাজী নই। আরো বলো, মেবারের একজন লোকও যতক্ষণ জীবিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ইচ্ছা পূর্ণ হবে না।' দূত ফিরে গেল দিল্লীতে।

এদিকে আলাউদ্দিন আশায় আশায় বসে আছেন—দূতের সঙ্গে কবে পদ্মিনী

দিল্লী এসে পৌছবে। তাঁর ধারণা ছিল দিল্লীর সুলতানের আদেশ পেয়ে ক্ষুদ্র মেবারের রানা ভয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই পদ্মিনীকে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু দূতের

মুখে সমস্ত ব্যাপার শুনে আলাউদ্দিন তো চটেই আগুন, তিনি তখনই সেনাপতিকে খবর পাঠালেন। সেনাপতি এলে তাকে জরুরী আদেশ দিলেন :

'এখনি সৈন্য সাজাও, আমি মেবার আক্রমণ করব।'

সুলতানের আদেশে সেনাপতি সৈন্য সাজাল—তারপর আলাউদ্দিন সৈন্যদল সঙ্গে নিয়ে চিতোরের দিকে রওনা হলেন।

এদিকে মেবারের রানাও যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়েছিলেন।

দুইদলে যুদ্ধ আরম্ভ হল—ঘোরতর যুদ্ধ, কেউ কাউকে পরাজিত করতে পারে না। উভয় পক্ষেই যথেষ্ট সৈন্যও মরতে লাগল।

তখন আলাউদ্দিনের মনে এক দুষ্ট বুদ্ধি জাগল। তিনি মেবারের রানাকে বলে পাঠালেন যে মেবারের সঙ্গে তাঁর কোন শক্রতা নেই, কাজেই তিনি আর যুদ্ধ না করেই দিল্লী ফিরে যাবেন। তবে পদ্মিনীর রূপের কথা শুনে তিনি এতদূর এসেছেন, কাজেই পদ্মিনীকে একবার দেখলেই তাঁর মনে আর কোন দুঃখ থাকবে না। রানাকেও তিনি বন্ধু ভাবে গ্রহণ করবেন।

রানা প্রথম ভাবলেন, যুদ্ধ যদি থেমে যায়, তবে তো ভালোই। কারণ দিল্লীর সুলতানের যত সৈন্য আছে, তাঁদের তত নেই। বেশিদিন যুদ্ধ হলে মেবারেরই পরাজয় হতে পারে—কাজেই আলাউদ্দিনের কথায় রাজী হওয়াই উচিত। কিন্তু তারপরই ভাবলেন—হিন্দু-রমণী হয়ে যদি পদ্মিনীকে আলাউদ্দিনের সামনে বেরুতে হয়, তাহলেও তো জাতির অপমান হবে।

এই সমস্ত সাত-পাঁচ ভেবে তিনি স্থির করলেন—প্রাণের চেয়ে মান বড়ো। যুদ্ধ করে বরং প্রাণ দেবেন, তবু আলাউদ্দিনের কথায় রাজী হবেন না। এদিকে খবর গিয়ে পৌঁছলো পদ্মিনীর কানে। তিনি ভাবলেন :

'আমার জন্যে চিতোরের সর্বনাশ হতে দেব না। শুধু একবার আমাকে দেখতে পেলেই যদি আলাউদ্দিন ফিরে যায়,—চিতোর রক্ষা হয়, তবে তা করাই ভালো।'

কিন্তু মেবারের যোদ্ধারা তাতে রাজী নয়। তখন রানা সবাইকে বুঝিয়ে বললেন। শেষটায় স্থির হল যে, পদ্মিনী আলাউদ্দিনের সামনে যাবেন না—আয়নার মধ্য দিয়ে আলাউদ্দিন তাঁকে দেখবেন।

আলাউদ্দিনের কাছে খবর পাঠানো হল। আলাউদ্দিন তাতেই রাজী হয়ে রানাকে বললেন :

'আপনি আমার বন্ধু! কাজেই কোন অস্ত্রশস্ত্র কিংবা লোকজন না নিয়েই আমি যাব। কাজেই আপনারাও কোন অস্ত্রশস্ত্র কিংবা লোকজন কাছে রাখবেন না। শুধু আমি আর ভীমসিংহ একসঙ্গে থাকব।'

তাই স্থির হল।

মেবারের রানা সরল প্রকৃতির লোক—তিনি সেই ভাবেই সব বন্দোবস্ত করলেন। কিন্তু আলাউদ্দিনের পেটে পেটে ছিল দুষ্ট বুদ্ধি। তিনি কতকগুলি সৈন্যকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে কাছের একটা ছোট পাহাড়ে লুকিয়ে রেখে নিজে দুই একজন দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে গেলেন পদ্মিনীকে দেখতে।

আলাউদ্দিন একটা ঘরে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর সামনে একটা প্রকাণ্ড আয়না টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। সেই ঘরেই আলাউদ্দিনের পিছনে একটা দরজা ছিল—পদ্মিনী একমুহূর্তের জন্যে দরজার কাছে দাঁড়িয়েই সরে গেলেন। মুহূর্তের জন্যে আয়নার মধ্যে পদ্মিনীর ছায়া পড়ল—আলাউদ্দিন আয়নায় সেই রূপ দেখেই অবাক্ হয়ে গেলেন। তিনি থমকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—চোখের আর পলক পড়ে না—পদ্মিনী যে চলে গেছেন, সে খেয়ালও তাঁর নেই। তিনি শুধু অবাক্ হয়ে ভাবছেন : নারীর দেহে এত রূপও থাকতে পারে!

হঠাৎ ভীমসিংহের ডাকে তাঁর চৈতন্য হল। তিনি ভীমসিংহকে বললেন :

'খুব খুশী হয়েছি বন্ধু! আমার আর কোন ইচ্ছা নেই। এবার আমি সৈন্য নিয়ে দিল্লী চলে যাব। আপনারা সুখে থাকুন।'

এই বলে গল্প করতে করতে ভীমসিংহকে সঙ্গে করে সেই ছোট পাহাড়টির

দিকে এগিয়ে চললেন। যখন পাহাড়টার খুব কাছে এসেছেন, তখন হঠাৎ একটা বাঁশি মুখে নিয়ে ফুঁ দিলেন।

আলাউদ্দিন আয়নায় সেই রূপ দেখেই অবাক্ হয়ে গেলেন। [পৃঃ…২১

সঙ্গে সঙ্গে পাঠান সৈন্যদল ছুটে এসে ঘিরে ফেলল ভীমসিংহকে। ভীমসিংহের সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই, লোকজন নেই। আলাউদ্দিনের সৈন্যদল ভীমসিংহকে বন্দী করে নিয়ে গেল শিবিরে—সেখানে তাঁকে কারাগারে আটকে রাখা হল।

তারপর আলাউদ্দিন খবর পাঠালেন রানা লক্ষ্মণসিংহের কাছে :

'আমার চিতোর জয়ের ইচ্ছা নেই, শুধু পদ্মিনীকে পেলেই আমি ভীমসিংহকে মুক্তি দেব। কিন্তু যদি পদ্মিনীকে না পাই, তবে চিতোর জালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেব।'

খবর শুনে সমস্ত রাজপুত সৈন্য মারমুখী হয়ে উঠল। একজন রাজপুত সৈন্যও জীবিত থাকতে আলাউদ্দিন পদ্মিনীর দেখা পাবে না।—প্রাণ যায় যাবে, তবু তারা মান দেবে না।

পদ্মিনী সমস্ত শুনলেন। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি আলাউদ্দিনের কাছে সংবাদ পাঠালেন যে তিনি আলাউদ্দিনের হারেমে তাঁর বেগম হয়ে থাকতে রাজী আছেন। তবে কয়টি শর্ত আছে :

আলাউদ্দিনের শিবিরে তাঁকে রীতিমত মর্যাদার সঙ্গে ঢুকতে দিতে হবে। সঙ্গে তাঁর সাত শত দাসী থাকবে। আর তারাও যাবে পদ্মিনীর মতোই পালকিতে চড়ে। শিবিরে যাবার আগে পদ্মিনী শেষবারের মতো কারাগারে গিয়ে তাঁর স্বামীকে দেখে আসবেন। তারপরই তাঁর কতক দাসী ফিরে আসবে, আর কতক যাবে তাঁর সঙ্গে শিবিরে। এই শর্ত যদি আলাউদ্দিন মেনে নেন তবেই তিনি দাসীদের সঙ্গে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে তাঁর হারেমেই থাকবেন।

পদ্মিনীর এই প্রস্তাবের কথা শুনে রাজস্থানের সমস্ত লোক ছি ছি করে উঠল।

তারা ভাবল : সুলতানের বেগম হবার লোভেই বুঝি পদ্মিনী মান-সম্মান বিসর্জন দিতে চাইছেন।

এদিকে আলাউদ্দিনের কাছে খবর গেল। তিনি খুবই খুশী হলেন এবং

আদেশ দিলেন পদ্মিনীকে সম্মান দেখানোর জন্যে সেদিন আর কোন সৈন্য-সামন্ত যেন উপস্থিত না থাকে। তিনি পদ্মিনীকেও খবর পাঠালেন যে তিনি শিবিরে আসবার আগে স্বামীর সঙ্গে শেষ বারের মতো দেখা করে আসতে পারেন। সৈন্যরা তাঁকে কোনো বাধা দেবে না।

পদ্মিনী সেজেগুজে পালকিতে চড়লেন। তাঁর পালকির পিছনে পিছনে আসতে লাগল কিছু বেশী সাত শ পালকি। জোয়ান জোয়ান বাহকেরা পালকি বয়ে নিয়ে আসছে। তারা প্রথমেই গেল কারাগারের সামনে—সব পালকিই সেখানে নামানো হল।

পদ্মিনী স্বামীর সঙ্গে দেখা করে এসে পালকিতে চড়লেন। কয়েকটা পালকি চিতোরে চলে গেল—আর বাকী পালকি শিবিরের দরজায় এসে থামল। আলাউদ্দিনের আদেশে সেপাই-শান্ত্রীরা অস্ত্র রেখে দিয়ে দূরে সরে গেল—আলাউদ্দিন পদ্মিনী আর তাঁর সখী এবং দাসীদের হারেমে নিয়ে যাবার জন্যে এগিয়ে এলেন।

একসঙ্গে সাত শ পালকির দরজা খুলে গেল—একসঙ্গে পালকি থেকে বেরিয়ে এল অস্ত্র হাতে সাত শত রাজপুত যোদ্ধা ; সঙ্গে সঙ্গে সাত শ পালকির বেহারারাও অস্ত্র হাতে নিল।

আচমকা আক্রমণে শিবিরের অধিবাসীরা ছুটে পালাল। আলাউদ্দিন কোনক্রমে প্রাণ বাঁচালেন। রাজপুত সৈন্যরা সমানে অস্ত্র চালাতে লাগল। ইতিমধ্যে পাঠান সৈন্যরাও তৈরী হয়ে গেল—তখন আর রাজপুত সৈন্যরা কুলিয়ে উঠতে পারল না।

হাজার হাজার পাঠান সৈন্যের সঙ্গে কয়েক শ রাজপুত সৈন্য আর কি করবে ? কতক মরল, কতক বন্দী হল—কিন্তু পিছন ফিরে পালাল না কেউ।

এদিকে কারাগারে গিয়ে আলাউদ্দিন দেখলেন, ভীমসিংহ সেখানে নেই। পদ্মিনী কারাগারে গিয়েই ভীমসিংহকে মুক্ত করে দুজনে পালকি চড়ে পালিয়ে

ছিলেন। দূরে ঘোড়া তৈরী ছিল—তারপর তাঁরা সেই ঘোড়ায় চড়ে আত্মরক্ষা করেছেন!

বেকুব বনে আলাউদ্দিন দিল্লী চলে গেলেন।

মুখ কালো করে আলাউদ্দিন দিল্লী ফিরে গেলেন [পৃঃ ২৬

এরপর বেশী দিন কাটল না। আরও বেশী সৈন্য নিয়ে আলাউদ্দিন হঠাৎ একদিন চিতোর আক্রমণ করে এমন ভাবে ঘিরে ফেললেন যে, কারো আর পালাবার পথ রইল না। চিতোরবাসীরা বুঝলেন—এবার আর রক্ষা নেই। তবু রাজপুত-সৈন্যরা প্রাণপণে পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

এদিকে চিতোর-রমণীরা বুঝলেন—আলাউদ্দিন এবার আগের অপমানের প্রতিশোধ নেবেন। রাজপুত-রমণীর সম্মান এবার আর রক্ষা করা যাবে না। তাঁরা তখন মান বাঁচানোর জন্য জহর-ব্রতের আয়োজন করলেন।

একটা প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গের মধ্যে বিরাট চিতা সাজানো হল। তারপর পদ্মিনী থেকে আরম্ভ করে একে একে সমস্ত রাজপুত-সুন্দরী ঝাঁপিয়ে পড়লেন চিতার বুকে। দেখতে দেখতে আগুন তাঁদের গ্রাস করে ফেলল।

এইভাবে চিতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার নামই জহরব্রত।

চিতোর-বীরদের পরাজিত করে বড় আশা বুকে নিয়ে নৃশংস আলাউদ্দিন যখন চিতোরে প্রবেশ করলেন, তখন দেখলেন—দাউ দাউ করে চিতার আগুন জ্বলছে, আর রাজপুত সুন্দরীরা তাতে পুড়ে ছাই হয়ে গেছেন।

আলাউদ্দিনের জঘন্য লালসা ব্যর্থ হল। মুখ কালো করে তিনি দিল্লী ফিরে গেলেন।

পদ্মিনী এবং তাঁর সঙ্গে শত শত রাজপুত-রমণী মান বাঁচানোর জন্য এইভাবে স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তাঁরা রইলেন বেঁচে।

ভারতের বিখ্যাত বীর সন্তান রাজপুতদের দেশ রাজপুতানা (যার নাম এখন রাজস্থান)—বিশাল রাজ্য, তার মধ্যে আবার বড় ছোট অনেক দেশীয় রাজা থাকতেন। তাঁদের কেউবা ধনে বড়, কেউবা জনে বড়, কেউবা বীরত্বে বড়। আর প্রায় সব সময়ই এঁরা সবাই থাকতেন স্বাধীন। তেমনি একজন রাজা—নাম তাঁর সর্দার রত্নরবতিয়া। কিন্তু রাজার নাম যত বড়ই হোক, রাজ্য কিন্তু ছিল বেশ ছোট—রাজ্যের নাম মৈরতা।

সর্দার রট্টরবতিয়ার এক মেয়ে—নাম মীরাবাঈ। সুন্দর মেয়ে—যেমন বাড়ি আলো-করা রূপ, তেমন মন-ভুলানো গুণ। অতি যত্নে সর্দার রট্টরবতিয়া মেয়েকে মানুষ করেন।

আর সব মেয়েদের মত মীরাবাঈ কিন্তু পুতুল খেলতে ভালবাসতেন না। অন্যেরা যেমন পুতুল নিয়ে দিন কাটিয়ে দেয়, মীরবাঈ তেমনি দিন কাটাতেন পূজা-পূজা খেলায়। আর তাছাড়া সত্যিকার পূজার ফুল তোলা, চন্দন বাটা, পূজার আয়োজন করা—এ সবের দিকেও তাঁর ঝোঁক ছিল খুব। কিন্তু এত ছোট মেয়ে—কাজেই কেউ বড়োদের পূজায় তাঁকে ডাকত না। বেচারী মীরাবাঈ আর কি করবেন, বড়োরা যখন পূজা-অর্চনা করেন তখন তিনিও চুপটি করে বসে থাকতেন তাঁদের পাশে। এতেই ছিল তাঁর আনন্দ।

একদিনের ঘটনা।

সর্দার রট্টরবতিয়ার বাড়ির পাশ দিয়েই বাজনা বাজিয়ে মশাল জেলে যাচ্ছে বরযাত্রীর দল। আর তাদের সঙ্গে আছে বর।

দৃশ্যটি ভারী ভালো লাগল মীরাবাঈয়ের। তিনি জিজ্ঞেস করে জানলেন যে পাড়ার একটি মেয়ের ঐদিন বিয়ে। বরযাত্রীদের সঙ্গে সেজেগুজে যে ছেলেটি যাচ্ছে, ঐ ছেলেটিই হল মেয়েটির বর।

শুনে অবধি মীরাবাঈ বায়না ধরে বসলেন—তাঁরও একটি বর চাই, তক্ষুনি। ছোট মেয়ে—বিয়ের ব্যাপার তাকে বুঝানো যায় না, ভবিষ্যতের কথা বললেও সে মানতে চায় না। তার বর চাই তক্ষুনি—দেরি হলে চলবে না।

বাপমায়ের আদরের মেয়ে—তার চোখে জল দেখে তাঁদের প্রাণে সয় না। কাজেই যে করেই হোক, তাকে প্রবোধ দিতে হবে। তখন তাঁরা কালো পাথরের ছোট্ট সুন্দর একটা কৃষ্ণমূর্তি এনে মীরাবাঈ-এর হাতে তুলে দিয়ে বললেন:

'এই নাও মা তোমার বর।'

সেই থেকে কৃষ্ণই হলেন মীরাবাঈ-এর বর, উপাস্য দেবতা। সারাদিন ঐ কৃষ্ণমূর্তি নিয়েই তার দিন কাটে। তাকে নাওয়ানো, সাজানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো—মায় পূজা করা পর্যন্ত। কোন কিছুই বাদ যেতে পারে না। ঐ অল্প বয়সে তার মনে ধারণা জন্মেছিল যে কৃষ্ণই তার স্বামী—ঐ ধারণাই তার মনের মধ্যে আসন গেড়ে বসেছিল। সারা জীবনে আর ঐ ধারণা দূর হয় নি।

সারাদিন ঐ কৃষ্ণমূর্তি নিয়েই তার দিন কাটে।

বাপ-মা অবাক্ হ'য়ে দেখতেন—কী ভক্তিভরে তাঁদের মেয়ে কৃষ্ণের সেবা করছে, পূজা করছে, আর গুন গুন করে গান করছে।

মীরাবাঈ-এর গলা ছিল খুব মিষ্টি। তিনি ছেলেবেলা থেকে খুব সুন্দর গান গাইতে পারতেন।

এদিকে দিন যায়—মীরা আর ছোট্ট মেয়েটি নেই; দিব্যি বড়োসড়ো হয়েছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মীরার রূপও বাড়ছে আর তার রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

রাজপুতানায় ছোট বড় অনেক রাজা আছেন। তাঁদের ঘরে উপযুক্ত ছেলেও ছিল অনেক। তাঁরা অনেকেই চাইলেন, মীরাবাঈকে ঘরের বধূ করে নেবার জন্যে। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রানা মুকুলদেব।

রাজপুতানার যে রাজ্যের খ্যাতি-প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশী, তার নাম মেবার—মেবারের অধিপতিই হলেন রানা মুকুলদেব। মুকুলদেব মীরাবাঈ-এর রূপগুণের কথা শুনে মন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন মৈরতায়। রানার ইচ্ছা হল যুবরাজ কুম্ভের সঙ্গে মীরাবাঈয়ের বিয়ে দেবেন।

যথাসময়ে মেবারের যুবরাজ কুম্ভের সঙ্গে খুব জাঁকজমকের মধ্যেই মীরাবাঈয়ের বিয়ে হয়ে গেল। মীরাবাঈ মেবারের রাজধানী চিতোরে এলেন স্বামীর ঘর করতে।

কিছুদিন পর রানা মুকুলদেবের মৃত্যু হলে কুম্ভ হলেন মেবারের রানা আর মীরাবাঈ হলেন রানী।

বিবাহিত জীবন কিন্তু তাঁদের সুখের হয় নি। মীরাবাঈও যেমন স্বামীকে সম্পূর্ণ আপন ভাবে নিতে পারেন নি, রানা কুম্ভ কিংবা তাঁর পরিবারের অন্য কেউই তেমনি মীরাবাঈকে সম্পূর্ণ আপন করে নিতে পারেন নি।

ছেলেবেলায় হয়তো খেলাচ্ছলেই কৃষ্ণকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন মীরাবাঈ—কিন্তু বড় হলেও কৃষ্ণই যে তাঁর স্বামী, মন থেকে এই ধারণা তাঁর কখনও দূর হয় নি। কাজেই কুম্ভকে তিনি সম্পূর্ণভাবে তাঁর ভক্তি, ভালবাসা

কিংবা সেবা দান করতে পারেন নি। তাঁর মনের সমস্ত শ্রদ্ধা-ভক্তিকে দুভাগ করে ফেলতে হয়েছিল।

আর ঐ দিকে রানা কুম্ভ এবং তাঁদের পরিবারের সবাই ছিলেন শাক্ত—চিতোরেশ্বরী ভগবতীকে তাঁরা উপাসনা করতেন। মীরাবাঈ ছিলেন বৈষ্ণব—কাজেই ধর্মমতের দিক দিয়েও তাঁদের মিল ছিল না। মীরাবাঈয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পছন্দ করতেন না যে মীরাবাঈ কৃষ্ণের ভজনা করেন। তাঁরা স্পষ্টই বলতেন :

এ পরিবারে থাকতে গেলে এই পরিবারের ধর্মমতই তাঁকে গ্রহণ করতে হবে।

দিশেহারা হয়ে পড়লেন মীরাবাঈ। তিনি যে ছেলেবেলা থেকে কৃষ্ণকেই ধ্যান-জ্ঞান বলে জেনে এসেছেন! আজ কি করে সেই কৃষ্ণ-চিন্তা ত্যাগ করবেন!

কিন্তু তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেদের কাছে কৃষ্ণ-ভজন বড় বাড়াবাড়ি বলেই মনে হল। তাঁকে তখন পরিষ্কার ভাবেই বলা হল—এ বাড়িতে থাকতে গেলে তাঁকে শাক্ত হয়েই থাকতে হবে। যদি কৃষ্ণের উপাসনা করতে হয়, তবে এ বাড়ির সীমানার বাইরে গিয়ে তা করতে হবে।

মহা ভাবনায় পড়লেন—কোন্ কূল রাখবেন তিনি? কৃষ্ণকেই তিনি জীবন-ভোর স্বামী বলে জেনে এসেছেন, কৃষ্ণই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান—তাঁকে ছেড়ে তিনি থাকবেন কী করে? আবার স্বামী, স্বামীর ঘর, লোকলজ্জা, এ সমস্ত ছেড়েই বা যাবেন কোথায়? শেষটায় কিন্তু কৃষ্ণ-প্রেমই তাঁকে বাইরে টানল। রাজবাড়ির এত ভোগ-বিলাস, এত সম্মান,—কোন কিছুই তাঁকে ধরে রাখতে পারল না।

মীরাবাঈকে স্বামীর ঘর ছাড়তে হল। প্রাসাদের বাইরে তাঁর জন্যে একটা আলাদা ঘর করে দেওয়া হল। সেখানে মীরাবাঈ থাকেন তাঁর কৃষ্ণমূর্তি নিয়ে। বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর আর কোন সম্পর্কই রইল না। কৃষ্ণ-সেবায়ই তিনি মেতে থাকেন।

এতদিন পর্যন্ত মীরাবাঈয়ের মন দুধারায় চলত—কিন্তু এখন আর কোন বাধা

নেই, তিনি সমস্ত মন-প্রাণ সম্পূর্ণভাবেই কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করলেন। কৃষ্ণ আর তাঁর কাছে কালো পাথরের মূর্তি নন—কৃষ্ণ তাঁর জীবন্ত দেবতা, কৃষ্ণ তাঁর স্বামী, কৃষ্ণ তাঁর ধ্যান-জ্ঞান।

কৃষ্ণের স্নান-খাওয়া, কৃষ্ণের সেবাযত্ন—এতেই যায় মীরাবাঈ-এর সময়। অবসর মতো কৃষ্ণের সঙ্গে তিনি গল্পগুজব করেন, কৃষ্ণকে তিনি গান শুনিয়ে তৃপ্ত করেন।

লোকে কানাকানি করে—মীরাবাঈয়ের স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়। স্বামীর ঘরে তাঁর মন টেকে না বলেই তিনি প্রাসাদ থেকে বাইরে চলে এসেছেন। আর সেখানেও তাঁর মনের লোক আছে—যার সঙ্গে একলা ঘরে বসে চুপি চুপি কথা বলেন।

কানে কানে সে কথা রানা কুম্ভের কানেও উঠল। মীরাবাঈ শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে দিলেও তাঁর নিন্দা শ্বশুরবাড়িকে না ছুঁয়ে পারে না। তাই সংবাদটা কানে উঠতেই রানা কুম্ভ ভীষণ চটে গেলেন। তিনি ভাবলেন—এর একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে।

খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে রানা কুম্ভ গেলেন মন্দির-প্রাঙ্গণে—দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। কান পেতে রইলেন কুম্ভ; ফিস্‌ফিস্ আওয়াজ তাঁর কানে এল, শুনতে পেলেন গুন গুন গান। তিনি বুঝলেন যা রটে, তার কতক বটে।

লোকে যে নিন্দা করে, তাতো তাহলে মিথ্যে নয়!

তিনি দরজায় ধাক্কা দিলেন—কিন্তু ভিতর থেকে কেউ দরজা খুলে দিলে না। দরজা ভেঙে তিনি ঘরে ঢুকে দেখলেন—সামনে কৃষ্ণমূর্তি নিয়ে ধ্যানমগ্না হয়ে বসে আছেন মীরাবাঈ। কুম্ভের ডাকে তিনি ফিরে তাকালেন। ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন কুম্ভ:

কার সঙ্গে তুমি কথা বলছিলে এতক্ষণ?

বিস্মিত হয়ে জবাব দেন মীরাবাঈ:

আমার প্রাণের ধন কৃষ্ণের সঙ্গে।

পাতি পাতি করে খুঁজলেন কুম্ভ মন্দিরের আনাচে কানাচে, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন তাঁর মনে হল—তবে হয়তো মীরার কথাই সত্যি! লোকে মিথ্যাই তাঁর নিন্দা করে।

মীরা যে একজন উচ্চস্তরের কৃষ্ণ-সাধিকা, তার পরিচয় পেয়ে রানা কুম্ভ খুবই খুশী হয়ে তাঁর সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। রাজভাণ্ডারের সাহায্য পেয়ে মীরাবাঈ মন খুলে দানধর্ম করেন আর প্রাণভরে কৃষ্ণের গুণগান করেন।

মীরাবাঈয়ের গলা ছিল অপূর্ব আর তিনি যে সমস্ত গান রচনা করেছিলেন, সেগুলিও ছিল অতি সুন্দর। এই ভজনগানগুলি দিয়েই তিনি কৃষ্ণের উপাসনা করতেন। ক্রমে মন্দির পার হয়েও তাঁর গানের খ্যাতি পৌঁছল চিতোরে। তারপর যত দিন যেতে থাকল, ততই বাইরে থেকে লোক এসে তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যেতে লাগল।

এইভাবেই লোকের মুখে মুখে মীরাবাঈয়ের ভজনগানের প্রশংসা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। নানা স্থান থেকে লোক এসে তাঁর গান শুনে যেত।

তখন দিল্লীর সিংহাসনে বসে ভারত শাসন করতেন সম্রাট্ আকবর। তিনিও শুনলেন মীরাবাঈয়ের গানের কথা। এত যাঁর গানের প্রশংসা, তাঁর গান শোনবার আগ্রহ হল আকবরেরও। আকবর ছিলেন গানের একজন মস্তবড় সমজদার—প্রকৃত গায়কদের তিনি খুবই আদর করতেন। তাই একজন প্রকৃত গুণীর খবর পেয়ে তিনি তাঁর গান শুনতে চাইলেন।

কিন্তু সে যে অসম্ভব ব্যাপার। একে তো হিন্দুঘরের মেয়ে,—তার উপর আবার মীরাবাঈ বাইরের জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাইতেন না। তিনি মনের আনন্দে আপন মনে গান গেয়ে কৃষ্ণের ভজনা করতেন—বাইরের লোকের প্রশংসা কুড়োবার ইচ্ছা তাঁর এতটুকুও ছিল না। কাজেই মীরাবাঈকে দিল্লী এনে তাঁর গান শোনা আকবরের পক্ষে সম্ভব হল না।

শোনা যায়, তারপর আকবর নিজেই নাকি ফকিরের বেশ ধরে মীরাবাঈয়ের মন্দিরে গিয়ে তাঁর গান শুনেছিলেন এবং খুশী হয়ে তাঁর গলার মুক্তার মালা খুলে দিয়েছিলেন মীরাবাঈয়ের পরমপ্রিয় 'নন্দলালা'র গলায় পরিয়ে দেবার জন্যে।

তারপর সেকথা উঠল রানা কুম্ভের কানে। তিনি ভীষণ চটে এসে মীরাকে বললেন :

এভাবে কুলে কলঙ্ক দেওয়ার চেয়ে তোমার বিষ খেয়ে মরা উচিত।

এই বলে কুম্ভ নিজেই বিষের বাটি তুলে দিলেন মীরাবাঈয়ের হাতে। মীরাবাঈ

একটুও আপত্তি করলেন না। জীবনে তিনি কৃষ্ণকে পেয়েছেন—আর কিছু কামনা তাঁর নাই—কাজেই মৃত্যুতেও তাঁর ভয় নেই। তিনি স্বামীর হাত থেকে বিষের বাটি তুলে নিলেন নিজের হাতে—তারপর এক চুমুকে পান করলেন বাটির সবটুকু বিষ।

কিন্তু কি আশ্চর্য—যে বিষ এক ফোঁটা মানুষের দেহে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটে, সেই বিষ এক বাটি খেয়েও মীরাবাঈ হাসিমুখে বসে রইলেন। তাঁর দেহে বিষপানের কোন ক্রিয়াই দেখা গেল না। অবাক্ হয়ে গেলেন রানা কুম্ভ, অবাক্ হলেন মন্দিরের সব লোক।

কিন্তু কুম্ভের মাথায় তখন খুন চেপেছে, তিনি আর মীরাবাঈকে সইতে পারছেন না; আদেশ দিলেন:

এ নিশ্চয়ই ডাইনী, দূর করে দাও একে আমার রাজ্য থেকে।

নির্বাসিত হলেন মীরাবাঈ। তিনি তাঁর প্রিয়তম 'নন্দলালা'কে বুকে তুলে নিয়ে বৃন্দাবনে চলে গেলেন। তারপর নানা তীর্থে ঘুরে ঘুরে শেষে পৌঁছলেন দ্বারকায়—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেখানে কাটিয়েছিলেন, তাঁর জীবনের শেষ অংশ।

মীরাবাঈয়ের ভজন আর তাঁর মুখের ধর্মকথা শুনে পাষাণেরও হৃদয় গলে যায়। দলে দলে লোক এসে তাঁর কাছে ভিড় করতে লাগল। এই সব শিষ্যের সাহায্যে তিনি দ্বারকায় এক মন্দির গড়ে তুললেন। ক্রমে তা সাধু, সন্ত আর বৈষ্ণবদের এক পরম তীর্থে পরিণত হল।

তারপর একদিন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। মন্দিরে পরিচিত অপরিচিত বহু ভক্তের ভিড় জমেছে—তারি মধ্যে এসে দাঁড়ালেন রানা কুম্ভ। মীরাবাঈকে শাস্তি দিতে নয়, নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি ফিরিয়ে নিতে এসেছেন মীরাবাঈকে।

লোকের কথায় কান দিয়ে তিনি যে অন্যায় করেছেন, মীরাবাঈয়ের উপর যে অত্যাচার করেছেন, তার জন্যে ক্ষমা চাইলেন মীরাবাঈয়ের কাছে।

যেতে রাজী হলেন মীরাবাঈ। যে কলঙ্ক রটেছিল তাঁর নামে, সেই কলঙ্ক দূর হল। তিনি যাবেন স্বামীর সঙ্গে স্বামীর ঘরে।

কিন্তু মন্দির ছেড়ে যাবার আগে শেষবারের মতো গেলেন তিনি তাঁর 'নন্দলালা'র সঙ্গে দেখা করতে। মীরাবাঈ মন্দিরের ভিতরে গিয়েছেন—বাইরে অপেক্ষা করছেন রানা কুম্ভ, যাবার জন্যে তৈরী হয়ে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন কুম্ভ, কিন্তু কই—মীরাবাঈ ফিরে আসছেন না তো! মন্দিরের দরজা খুলে তিনি ভিতরে গেলেন। কিন্তু কোথায় মীরাবাঈ—মন্দিরে তো নেই? অথচ মন্দির থেকে বেরুবারও তো কোন পথ নেই!!—তবে কি হল?

মন্দিরের বাইরে কোথাও মীরাবাঈকে দেখা গেল না। লোকে বলে—তিনি তাঁর প্রিয়তম নন্দলালার দেহের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন।

বাঙ্গালী জাতি ভীরু। তারা নাকি যুদ্ধ করতে জানে না—রাজকার্য চালাতে পারে না। একথা বিদেশীরা অনেকেই বলে থাকে। বিশেষ করে বাঙ্গালী মেয়েদের তো কথাই নেই। তাদের জন্মই নাকি শুধু ঘরকন্নার জন্যে। এর বাইরে কোন কাজকর্ম করবার ক্ষমতা যে তাদের আছে, তা কেউ মানতেই চাইত না। অথচ উপযুক্ত সুযোগ পেলে তারাও যে পুরুষের মতোই, কিংবা অনেক

পুরুষের চেয়েও ভালোভাবে রাজ্য পর্যন্ত শাসন করতে পারে—তার দৃষ্টান্ত রয়েছে আমাদের চোখের সামনেই।

আমরা ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ, ভিক্টোরিয়া প্রভৃতির নাম জানি—কিন্তু ভারতবর্ষে এবং বাংলা দেশেও যে এ রকম রমণী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তার ইতিহাস সকলের জানা নেই।

রাজশাহী জেলার ছাতিনা গ্রাম—সেই গ্রামের একজন অধিবাসী আত্মারাম চৌধুরী। অবস্থা তাঁর বেশ ভালোই—দীন-দুঃখীও তাঁর বাড়ি থেকে ফিরে যায় না। সেই আত্মারাম চৌধুরীর এক মেয়ে—রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, নাম তাঁর ভবানী। ছেলেবেলা থেকেই দীন-দুঃখীর প্রতি তাঁর খুব দয়া ছিল।

যথাসময়ে সেই মেয়ের বিয়ে হল সুপাত্রের সঙ্গেই—পাত্রের নাম রামকান্ত রায়। নাটোরের রাজা রামজীবন রায়ের একমাত্র ছেলে।

তখনও আমাদের দেশে ইংরেজ-শাসন আরম্ভ হয় নি। দিল্লীতে ছিলেন মোগল বাদশাহ, আর বাংলাদেশে ছিলেন নবাব। তাহলেও দেশের নানাস্থানে যে সমস্ত জমিদার ছিলেন, তাঁদেরও ক্ষমতা বড় কম ছিল না। তাঁরাও ছিলেন ছোটখাটো রাজা। নবাব সরকারে যথাসময়ে খাজনা দাখিল করলেই তাঁদের স্বাধীনতা বজায় থাকত।

তেমনি এক জমিদারি ছিল নাটোরে—নাটোরের রাজা রামজীবন রায় ছিলেন তার জমিদার। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র রামকান্ত রায়ের বিয়ের জন্য পাঠালেন তাঁর পুরানো কর্মচারী দয়ারামকে। দয়ারাম নানা জায়গায় পাত্রী খুঁজতে লাগলেন। ছাতিনা গ্রামে ভবানীকে দেখে তাঁর খুব পছন্দ হল। এরপর শুভদিনে রামকান্তের সঙ্গে ভবানীর বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পর জীবন তাঁদের সুখেই কাটছিল। ভবানী ছিলেন সাধারণ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, সামান্যই লেখাপড়া জানতেন। বিয়ের পর ভবানীকে ভালোভাবে লেখাপড়া শেখানোর জন্যে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হল। একজন

বেশ লেখাপড়া-জানা মহিলা তাঁর শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন। খুব কম দিনের মধ্যেই ভবানী বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করলেন—ব্যাকরণ, রাজনীতি, পুরাণ, অঙ্ক, সংস্কৃত প্রভৃতি বিষয় তিনি ভালোই শিখেছিলেন। স্বামীর কাছ থেকে রাজ্যশাসন ব্যাপারেও তিনি বেশ জ্ঞানলাভ করেছিলেন। বৃদ্ধ দেওয়ান দয়ারাম পর্যন্ত রাজ্যশাসন-ব্যাপারে সময় সময় ভবানীর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। ভবানী যে খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন, এসব থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এর মধ্যে বৃদ্ধ রাজা রামজীবন রায়ের মৃত্যু হয়। তখন সমস্ত নাটোর রাজ্যের শাসনভারই পড়ে রামকান্তের হাতে।

এমন সময় এক গণ্ডগোল দেখা দিল। রামকান্ত রায় ছিলেন রামজীবন রায়ের দত্তকপুত্র। রামজীবনের ভাইয়ের ছেলে ছিলেন দেবীপ্রসাদ। তিনি নবাবের নিকট রামকান্তের নামে নালিশ করলেন। তিনি বললেন: রামকান্তকে রামজীবন শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী দত্তক গ্রহণ করেন নি—কাজেই আইনতঃ এবং ধর্মতঃ রামকান্ত তাঁর পুত্র নন এবং সেই কারণেই নাটোর রাজ্যে তাঁর কোন অধিকার নেই। এরপর রং চড়িয়ে তিনি আরও বললেন যে, রামকান্ত অত্যন্ত দুশ্চরিত্র—নানা বাজে খেয়ালে তিনি টাকা ওড়ান। ফলে যথাসময়ে নবাব সরকারে খাজনা দাখিল করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। যদি দেবীপ্রসাদকে রাজা করা হয়, তাহলে নবাব ঠিক সময়ে খাজনা পাবেন। তাছাড়া তিনি আগের দ্বিগুণ খাজনা দেবেন নবাবকে,—এই লোভও দেখালেন।

আলীবর্দি খাঁ তখন সবেমাত্র বাংলার নবাব হয়েছেন। তিনি ভাবলেন, বেশী টাকা খাজনা পাওয়া গেলে তো ভালোই। কাজেই তিনি বিশেষ বিচার বিবেচনা না করেই দেবীপ্রসাদকে সনদ দিয়ে নাটোরে পাঠিয়ে দিলেন। আর সঙ্গে পাঠালেন একদল সৈন্য—রাজবাড়ি থেকে লুটপাট করে টাকাপয়সা নিয়ে আসতে।

নবাবের সৈন্যদল নাটোরে এসে হাজির হতেই রামকান্তের প্রাণ কেঁপে উঠল।

তিনি বুঝলেন—এবার তাঁর রক্ষা নেই,—নবাবের সৈন্যরা এবার হয়তো তাঁকে বন্দী করবে।

বন্ধুবান্ধব যারা ছিল, তারা এ দুঃসময়ে কেউ এল না। তখন ভবানীর পরামর্শে রামকান্ত ভবানীকে নিয়ে মুর্শিদাবাদে পালিয়ে গেলেন। যাবার সময় তাড়াতাড়িতে টাকাকড়ি ধন-রত্ন কিছুই নিতে পারলেন না। রাণীর গায়ে যে কয়খানা অলংকার ছিল, তাই নিয়েই প্রাণ বাঁচালেন।

দেবীপ্রসাদের সঙ্গে নবাব সৈন্যদল নাটোরে ঢুকে ইচ্ছামত লুটপাট করল—কেউ বাধা দিল না। দেবীপ্রসাদ নাটোরের সিংহাসনে বসলেন।

রামকান্ত রায় ভবানীকে নিয়ে মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের আশ্রয় গ্রহণ করলেন—জগৎশেঠ সমাদর ক'রে তাঁদের স্থান দিলেন।

নাটোরের দেওয়ান দয়ারাম রাজকর্ম থেকে অবসর নিয়ে দীঘাপাতিয়ায় বাড়ি তৈরি ক'রে বাস করছিলেন। তিনি সংবাদ পেয়েই মুর্শিদাবাদে এসে রামকান্তের সঙ্গে দেখা করলেন। সকলে মিলে অনেক পরামর্শ করলেন। তারপর ঠিক হল তাঁরা নবাব আলীবর্দির সঙ্গে দেখা করে সব কথা জানাবেন। ভবানীর গায়ে যে অলংকার ছিল, সেগুলো সব বিক্রি করা হল। সেই টাকায় অনেক উপহার যোগাড় করে দয়ারাম জগৎশেঠকে নিয়ে নবাব আলীবর্দির কাছে গিয়ে হাজির হলেন।

এদিকে দেবীপ্রসাদের অত্যাচারে প্রজাগণও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এবং সে খবরও যথাসময়ে নবাব-দরবারে এসে পৌছেছিল। এমন সময় দয়ারাম প্রচুর উপহারসহ আলীবর্দির কাছে উপস্থিত হলেন এবং সমস্ত ব্যাপার খুলে বললেন।

নবাব তখন কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখলেন এবং বুঝলেন যে রামকান্তই নাটোরের প্রকৃত মালিক। তারপর দয়ারামের চেষ্টায় নবাব আবার দেবীপ্রসাদকে তাড়িয়ে দিয়ে রামকান্তকেই সিংহাসন দান করলেন।

রামকান্ত ভবানীকে সঙ্গে নিয়ে নাটোরে ফিরে এলেন।

দেবীপ্রসাদের অত্যাচারে বহু প্রজার সর্বনাশ হয়েছিল—ভবানী নাটোরে ফিরে এসেই প্রথম সেই প্রজাদের দুঃখ দূর করতে অগ্রসর হলেন। যাদের বাড়িঘর নষ্ট হয়েছিল তাদের বাড়িঘর তৈরি করে দেওয়া হল, যাদের রাজ্য থেকে তাড়িয়ে

প্রচুর উপহারসহ আলীবর্দির কাছে উপস্থিত হলেন—পৃষ্ঠা ৪০

দেওয়া হয়েছিল, তাদের আবার রাজ্যে ডেকে আনা হল। তারপর খুব জাঁকজমক করে রামকান্তের রাজ্যাভিষেক উৎসব সম্পন্ন হল।

বিশাল রাজ্য—ধনজন কোন কিছুরই অভাব নেই। তবু রামকান্ত ও ভবানীর মনে কোন সুখ ছিল না। ভবানীর পর পর দুটো ছেলে হয়েছিল,

কিন্তু তার একটিও বাঁচল না। তারপর এক মেয়ে হল—মেয়ের নাম তারাসুন্দরী।

যে পলাশীর যুদ্ধে দেশের শাসনভার মুসলমানদের হাত থেকে ইংরেজের হাতে চলে গেল, সেই পলাশীর যুদ্ধের আট-দশ বছর আগেকার কথা। ভবানীর বয়স তখন মাত্র চব্বিশ বছর। সেই সময় অকস্মাৎ রামকান্তের মৃত্যু হল।

বাংলার তখন দারুণ দুঃসময়। বাংলা দেশে তখন বর্গীর হাঙ্গামা লেগেই আছে। মারাঠা দস্যুরা বাংলার নানাস্থানে লুঠতরাজ করে বেড়াচ্ছে। এই সুযোগ বুঝে বাংলার অনেক জমিদারই বিদ্রোহী হয়ে উঠে বর্গীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। বাংলার সব জায়গায় অশান্তি চলছে।

সেই সময় রামকান্তের মৃত্যুতে নাটোর রাজ্যের মহা দুর্দিন দেখা দিল। কিন্তু ভবানী তাতে বিচলিত হলেন না। তিনি রাজ্যশাসনভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। অর্ধেক বাংলা জুড়ে তখন নাটোর রাজ্য। আর তার আয় তখন দেড় কোটি টাকা। এই বিরাট রাজ্যের ভার নিলেন এক বাঙ্গালী নারী—বয়স তখন তাঁর খুবই কম। ভালো মাঝি যেমন ঝড়ের মধ্যেও শক্তহাতে নৌকার হাল ধরে তাকে তীর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, ভবানী তেমনি এই দুর্দিনেও খুব নিপুণভাবে রাজ্যশাসন করেছিলেন। তাঁর রাজ্যশাসন ব্যবস্থা এমন চমৎকার ছিল যে, একবার স্বয়ং নবাব আলীবর্দি পর্যন্ত নিজের পরিবারের লোকদের নিয়ে তাঁর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

রাজা রামকান্তের স্ত্রী ভবানী এবার সত্যি সত্যি রাণী হলেন—ভবানী হলেন, রাণী ভবানী।

রাণী ভবানী রাজ্যের ভার হাতে নিয়ে একদিকে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেন, অন্যদিকে দানধ্যান করে লোকের দুঃখ মোচন করতে লাগলেন। তিনি পশ্চিম অঞ্চল থেকে খুব বলিষ্ঠ যুবকদের এনে তাঁর সৈন্যদলে ভরতি করে নিলেন। এই সৈন্যরাই বর্গীদের তাড়িয়ে দিয়ে তাঁর রাজ্যের শৃঙ্খলা বজায়

রেখেছিল। এদেরই সাহায্যে রাণী ভবানী পঞ্চাশ বছর ধরে সুন্দরভাবে রাজ্যশাসন করেছিলেন—আর এই দীর্ঘকালের মধ্যে কখনও তাঁর খাজনা বাকি পড়ে নি।

রাজ্যের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে রাণী ভবানী দানধর্মে মন দিলেন। তিনি ভাবলেন—এত ধন দিয়ে কী হবে? একজনের ভোগে আর কত লাগে? রাজ্যশাসনের জন্যে যা প্রয়োজন তার অতিরিক্ত জমিয়ে রাখলে কারো লাভ নেই—এই সমস্ত ভেবেই তিনি মুক্তহস্তে দান করতে লাগলেন। সেকালের অন্য কোন রাজা কিংবা রাণী এত দান করেছেন বলে শোনা যায় নি।

তিনি রাজবাড়িতে অন্নসত্র খুললেন—যে যখন সেখানে খেতে চাইত, সেই পেট ভরে খেয়ে যেতে পারত। যারা রান্না-করা ভাত খেত না, তাদের সিধে দেওয়া হত—তারা আলাদা রান্না করে খেত! তাঁর আদেশে তাঁর রাজ্যের কোন লোকই অনাহারে থাকতে পেত না।

যে কেউ তাঁর কাছে মনের দুঃখের কথা খুলে জানাত, রাণী ভবানী তারই দুঃখমোচন করতেন। রাজ্যের যেখানে জলকষ্ট ছিল, সেখানে পুকুর কিংবা কুয়া খুঁড়ে তিনি প্রজাদের জলকষ্ট দূর করতে চেষ্টা করতেন।

রাজ্যে রোগ দেখা দিলে তা যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, প্রজারা যাতে রোগে ভুগে কষ্ট না পায়, সেই কারণে তিনি স্থানে স্থানে দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন।

রাণী ভবানীর জনকয়েক মাইনে-করা কবিরাজ ছিলেন—তাঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রজাদের চিকিৎসা করতেন। তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে দুতিনজন করে চাকর থাকত, আর তাঁদের সঙ্গে থাকত ওষুধ ও রোগীদের উপযুক্ত পথ্য। কাজেই কবিরাজরা শুধু চিকিৎসাই করতেন না—সঙ্গে সঙ্গে গরিব রোগীদের বিনা পয়সায় পথ্যেরও যোগান দিতেন।

রাজবাড়িতে বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে রাণী ভবানী যেন একেবারে দানের

বন্যা বইয়ে দিতেন। প্রতি বছর দুর্গাপূজার সময় তিনি অন্ততঃ দুহাজার কুমারী ও সধবা নারীকে শাড়ি দান করতেন। প্রতিপদ থেকে আরম্ভ করে নবমী পর্যন্ত প্রত্যহ সোনার গয়না দিয়ে শত কুমারী পূজা করতেন আর পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো ব্যয় করতেন ব্রাহ্মণ-বিদায়ে। এ ছাড়া দেওয়ানের প্রতি আদেশ ছিল যে একশত টাকা পর্যন্ত কাউকে দান করতে রাণীর আদেশেরও প্রয়োজন হবে না।

রাণী ভবানী একবার বহু গরিবকে দান করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজভাণ্ডারে হঠাৎ টাকার অভাব হল। তখন তিনি খামারের শস্য আর গায়ের অলংকার বিক্রি করে সেই টাকা দান করে নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। এ ছাড়া তিনি বাংলাদেশের নানা জায়গায় যে সমস্ত দেবোত্তর আর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি দান করেছিলেন তার পরিমাণও পাঁচ লক্ষ বিঘার কম নয়। বাংলাদেশের অনেক ব্রাহ্মণই এখন পর্যন্ত সেই সমস্ত সম্পত্তি ভোগদখল করছেন।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে যখন সারা বাংলাদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী দেখা দিয়েছিল তখন রাণী ভবানী অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ এবং পথ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণ রক্ষা করেছিলেন।

এই সমস্ত তো গেলো রাণী ভবানীর দানের দিক। দান করা ছাড়াও তাঁর বহু গুণ ছিল। অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতিতে জ্ঞানও ছিল যথেষ্ট।

ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিকে দেশে যখন শিল্পবাণিজ্যের যথেষ্ট অবনতি ঘটেছিল তখন রাণী ভবানীর রাজ্যে কিন্তু ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়। এ থেকেই বোঝা যায় অর্থনীতি বিষয়েও তাঁর কতখানি জ্ঞান ছিল।

সেকালের শিক্ষাবিস্তারেও রাণী ভবানীর দান কম ছিল না। প্রজারা যাতে মূর্খ না থাকে, যাতে তারা লেখাপড়া শিখতে পারে সেজন্য প্রতি বৎসর তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করতেন। সেই টাকায় দেশে অসংখ্য টোল স্থাপিত হয়েছিল।

অত বড় রাজ্যের রাণী ছিলেন ভবানী—কিন্তু তাঁর মনে কোন অহংকার ছিল

না। অতি সাধারণ বিধবার মতোই তিনি দিন যাপন করতেন। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে তিনি জপে বসতেন—তারপর বাগান থেকে পুজোর জন্যে নিজের হাতে ফুল তুলতেন। এরপর স্নান আহ্নিক পূজো প্রভৃতি শেষ করে তিনি পুরাণ পাঠ শুনতেন। দুপুরে বাড়ির সমস্ত লোকের আহার শেষ হলে তবে তিনি হবিষ্যান্ন গ্রহণ করতেন। খাওয়াদাওয়ার পর তিনি রাজকর্মচারীদের সঙ্গে রাজকর্ম বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে তার ব্যবস্থা করতেন। আদেশ কাগজে লিখে নীচে নাম সই করে তাতে আবার মোহরের ছাপ দিয়ে দিতেন।

রাণী ভবানীর একমাত্র কন্যা তারাসুন্দরী অতি রূপবতী এবং গুণবতী ছিলেন—সুপাত্রের সঙ্গেই তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের অল্পদিন পরেই তারাদেবী বিধবা হয়ে ফিরে আসেন মায়ের কাছে। তারাদেবী সারাদিন সাধন-ভজন নিয়েই থাকতেন।

রাণী ভবানী তখন এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন—সেই পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ। ক্রমে রামকৃষ্ণ বড় হলেন। এদিকে ছোটখাট কতকগুলি বিষয় নিয়ে সরকারের সঙ্গে রাণী ভবানীর বিরোধ ঘটে। তখন তিনি রাজ্যভার পুত্র রামকৃষ্ণের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন কাশীধামে।

কাশীতে এসে তিনি মনের শান্তি ফিরে পেলেন। তখন তিনি পরম সুখে ধর্ম-কর্ম আর দানধ্যান করে দিন কাটাতে লাগলেন। কাশীতে কতভাবে কত দান যে তিনি করে গিয়েছেন, তার সীমা নেই।

তিনি কাশীতে তাঁর বাড়িতে একটি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা করে তাতে রোজ আট মণ ছোলা ভিজিয়ে রাখতেন। কেউ জল খেতে চাইলে ঐ ছোলা ভিজানো আর জল দেওয়া হত। এ থেকেই বোঝা যায়, রোজ কত লোক তাঁর বাড়িতে আসত।

তাঁর বাড়িতে প্রত্যহ যে দেবদেবীর ভোগ রাঁধা হত তাতে প্রায় পাঁচ হাজার লোক পেট পুরে খেতে পারত। অন্নপূর্ণার মন্দিরে তিনি রোজ অনাথ ভিখিরীদের

প্রায় পঁচিশ মণ চাউল ভিক্ষা দিতেন ; এ ছাড়া নিজের বাড়িতে ১০৮ জন কুমারী, সন্ন্যাসী, বিধবা ও দণ্ডীকে নিজের ইচ্ছামতো খাওয়াতেন এবং এক টাকা করে দক্ষিণা দিতেন।

এরূপ শোনা যায় যে, রাণী ভবানী প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করে উঠে একখানি করে পাকাবাড়ি ব্রাহ্মণকে দান করতেন। এ ছাড়াও কাশীতে তিনি আরও অনেক বাড়ি তৈরি করে দরিদ্রদের থাকতে দিতেন। শুধু থাকতে দেওয়া নয়, যাতে তাদের সমস্ত খরচ চলে, সেই ব্যবস্থাও তিনি করে দিয়েছিলেন।

কাশীর প্রসিদ্ধ অন্নপূর্ণার মন্দির এবং আরও অনেক দেব-দেবীর মন্দির তিনি গড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং যাতে ঐ সমস্ত মন্দিরের খরচ চালানো যায়, তারও পাকাপাকি বন্দোবস্ত তিনি করেছিলেন।

রাণী ভবানী কাশীর পাঁচ ক্রোশের মধ্যে ক্রোশ অন্তর দীঘি কাটিয়ে এবং ছায়াতরু রোপণ করে কাশীর যাত্রীদের পথকষ্ট নিবারণ করেছিলেন। ঐ সমস্ত জায়গায় অন্নসত্র খুলে তিনি পথিকদের আহারেরও ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

শুধু কাশীতে নয়—বাংলাদেশের নানাস্থানে রাণী ভবানী অনেক মঠ, মন্দির নির্মাণ করেছিলেন এবং নানাস্থানে পুকুর খনন ও বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন।

হিন্দু তীর্থস্থানগুলির মধ্যে কাশী ছাড়া গয়াতেও তিনি অনেক পুণ্যের কাজ করেছিলেন। সেখানেও তিনি অনেক মন্দির তৈরি করে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গয়ার পাশ দিয়ে চলে গেছে ফল্গু নদী। ফল্গু নদী অন্তঃসলিলা —উপরে তার জল নেই, মাটি খুঁড়লে তবে জল বেরোয়। এ জন্য তীর্থযাত্রীদের স্নান, পূজা, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সম্পন্ন করতে খুবই কষ্ট হত। এই দেখে রাণী ভবানী গয়ার নিকট দুখানা গ্রাম কিনে সেখানে লোক বসালেন। তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত রইল যে তারা খুব ভোরে উঠে ফল্গু নদীতে মাটি খুঁড়ে জল বের করে রাখবে —যাত্রীরা পরে সহজেই সেই জলে স্নান-পূজা ইত্যাদি করতে পারবে।

এদিকে রাণী ভবানীর পোষ্যপুত্র রামকৃষ্ণ রাজ্যভার হাতে নিলেও রাজ্যের শাসনব্যবস্থার দিকে বিশেষ নজর ছিল না। তিনিও মায়ের মতো সাধন-ভজন নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ফলে জমিদারির অবস্থা কাহিল হয়ে উঠল। তখন রাণী ভবানী এই সমস্ত ব্যাপার জেনে আবার দেশে ফিরে এলেন। রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবনযাপন করতেন। রাণী ভবানী বেঁচে থাকতে থাকতেই রামকৃষ্ণের মৃত্যু হয়।

রাণী ভবানীর শেষ জীবন কাটে গঙ্গাতীরে মুর্শিদাবাদ জেলার বড়নগরে। সেই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি নিজে হাতে রান্না করে খেতেন, আর জপতপ নিয়েই দিন কাটাতেন।

রাণী ভবানীর দানের পরিমাণ অন্ততঃ পঞ্চাশ কোটি টাকা। প্রায় আশি বছর বয়সে গঙ্গাতীরে রাণী ভবানীর মৃত্যু হয়। রাণী ভবানী তাঁর কাজেকর্মে প্রমাণ করে গেলেন যে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে সাধারণ বাঙ্গালী মেয়েও রাজ্য চালাতে পারেন।

অহল্যা বাঈ

মারাঠা দেশের পাথরভর্তি ছোট একটি গ্রাম। সেই গ্রামের একজন অধিবাসী — নাম আনন্দরাও সিন্ধে। সিন্ধে একজন সাধারণ চাষী, এককালে অবস্থা তাদের ভালোই ছিল—কিন্তু যখনকার কথা বলছি, তখন তার অবস্থা আর ভালো নয়। চাষবাস করে কোন রকমে তার দিন কাটে।

আনন্দরাও সিন্ধের একমাত্র সন্তান—অহল্যা। এ ছাড়া সিন্ধের কোন পুত্র কিংবা অন্য কোন কন্যাও ছিল না। তাই ছেলেবেলা থেকেই অহল্যা ছিল বাপমায়ের বড় আদরের মেয়ে।

অহল্যা দেখতে শুনতেও ভালোই ছিল—তবে তেমন অপরূপ সুন্দরী ছিল না। কিন্তু তবু যে একবার তার দিকে তাকাত, সে আর সহসা চোখ ফেরাতে পারত না। তার কারণ, অপরূপ রূপ না থাকলেও অহল্যার দেহে ছিল একটা লক্ষ্মীশ্রী। তার চাল-চলনে, আচার-ব্যবহারে এমন একটা লক্ষ্মীযুক্ত ভাব ছিল যে, তার দিকে তাকালেই লোকের চোখ জুড়িয়ে যেত। সবাই বলত, বড় লক্ষ্মী মেয়ে এই অহল্যা।

ধর্মে-কর্মে ছেলেবেলা থেকেই অহল্যার খুব ঝোঁক ছিল। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ফুল তোলা, নিকিয়ে মুছিয়ে ঠাকুরঘর পরিষ্কার করা, পূজার আয়োজন করা,—এই সমস্ত কাজে অহল্যার আনন্দ ছিল প্রচুর। ব্রত, পূজা ইত্যাদি ব্যাপারেও তার সমান আনন্দ ছিল। খুব মন দিয়ে ভক্তিভরে সে এই সব কাজ-কর্ম করত।

তা ছাড়া অহল্যার মনে দয়াধর্মও ছিল যথেষ্ট। বাড়িতে ভিখারী এলে খেলাধুলা ফেলে দৌড়ে এসে মুঠি ভরে চাউল নিয়ে ভিখারীকে দান করত। ভিখারীরা দুহাত তুলে আশীর্বাদ করত—'রাজরাণী হও মা।'

ছেলেবেলা এক গণকও তার হাত দেখে বলেছিলেন যে এই মেয়ে নিশ্চয়ই রাজরাণী হবে। আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপড়শী কেউ সেদিন তা সত্যি হবে বলে ভাবতে পারে নি।

কিন্তু ভিখারীদের আশীর্বাদ আর গণকের এই গণনা কিছুকাল পরেই সত্য বলে প্রমাণিত হল—অহল্যা সত্যি রাজরাণী হলেন।

ইন্দোরের মহারাজ তখন মলহররাও হোলকার। কোন কাজ উপলক্ষে

মহারাজ একবার সৈন্যদল সহ কোথায় যাচ্ছিলেন। পাথরডি গ্রামের কাছে আসতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। সামনে আর কোন গ্রাম নেই। কাজেই সেখানেই মারুতি মন্দিরের সামনে মহারাজ তাঁবু ফেলতে আদেশ দিলেন। সৈন্যদের নিয়ে মহারাজ ঐ রাত্রি পাথরডি গ্রামেই কাটালেন।

পরদিন ভোর না হতেই সারা গাঁয়ে সাড়া পড়ে গেল যে, দেশের মহারাজ এসেছেন তাদেরই গ্রামে। গ্রামের লোক দলে দলে এল মহারাজকে দেখতে, ছেলে-বুড়ো সবাই এল মহারাজকে তাদের শ্রদ্ধা জানাতে।

গ্রামের অন্যান্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অহল্যাও এসেছে মারুতি মন্দিরের সামনে। কিন্তু মহারাজকে তারা দেখতে পাচ্ছে না—চারিদিকে লোকে একেবারে ঘিরে আছে। এই ভিড় ঠেলে মহারাজের কাছে যেতে সাহসও হয় না। তবু একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে অহল্যা! কিছু এগিয়েই অহল্যা দেখল—মহারাজের কাছেই বসে আছেন গাঁয়ের পাঠশালার পণ্ডিত মশাই। তাঁকে দেখে অহল্যার মনে কিছুটা সাহস এল—সে এগিয়ে যেতে যেতে একেবারে মহারাজের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

এমন লক্ষীমন্ত মেয়েটিকে দেখে মহারাজ তাকে ডেকে কাছে নিয়ে আদর করে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। গাঁয়ের লোকেরা তার পরিচয় দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রশংসাও করল যথেষ্ট। মহারাজা খুশী হয়ে তার হাতে কিছু খাবার দিলেন।

মহারাজ নিজে মেয়েকে ডেকে নিয়ে আদর করেছেন। এই সংবাদ শুনে অহল্যার বাপ-মা খুব খুশী পাড়াপড়শীর কাছে এই নিয়ে গর্ব করেন। পাড়াপড়শীরাও শোনে, কিন্তু তাতে তারা অবাক্ হবার মতো কিছু খুঁজে পায় না।

কিন্তু সকলে মিলে সত্যিই অবাক্ হল কদিন পরেই।

ইন্দোর থেকে ঘটক এসেছে আনন্দরাও সিন্ধের বাড়িতে—মহারাজ মলহররাও হোলকারের পুত্র কুমার খাণ্ডে রাও-এর সঙ্গে অহল্যার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে।

অহল্যার বাপ-মা অবাক্ হলেন, পাড়াপড়শীরা অবাক্ হল, অবাক্ হল সারা গাঁয়ের লোক। মহারাজকুমারের সঙ্গে চাষীর মেয়ের বিয়ে !

মহারাজা খুশী হয়ে তার হাতে কিছু খাবার দিলেন [পৃঃ…৫০

কিন্তু গল্পও নয়, গুজবও নয়—একদিন সত্যি সত্যি মহারাজকুমার খাণ্ডে রাও-এর সঙ্গে চাষীর মেয়ে অহল্যার বিয়ে হয়ে গেল।

অহল্যার বয়স তখন মাত্র নয় বৎসর—পুতুলখেলার বয়সও তাঁর পার হয় নি। কাজেই রাজরাণী হবার নামে অহল্যা নেচে ওঠেন নি। বরং তাঁর খেলার সাথীদের, আর নিজের বাপমাকে ছেড়ে যেতে হবে ভেবেই অহল্যার মনে দুঃখ হল।

বিয়ের পর অহল্যাবাঈ শ্বশুরবাড়ি চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন—সে এক বিরাট ব্যাপার। গল্পে-শোনা রাজবাড়ির চেয়েও তার জাঁকজমক অনেক বেশী। কত লোকজন, ধনরত্ন, বাড়িঘর!—অবাক্ হয়ে যান অহল্যাবাঈ!

মহারাজ নিজে পছন্দ করে চাষীর মেয়েকে বউ করে ঘরে এনেছেন, কিন্তু মহারাণীর এটা পছন্দ হয় নি। তিনি খুঁতখুঁত করতে লাগলেন।

কিন্তু অল্পদিন পরেই তাঁর মনের খুঁতখুঁতুনি চলে গেল। অহল্যাবাঈ একে একে যখন সংসারের ভার সবটুকু নিজের হাতে তুলে নিলেন, তখন যেন সংসারের শ্রী শতগুণে বেড়ে গেল।

গরিবের ঘরের কন্যা অহল্যা—রাজবাড়ির অর্থের অপচয় তাঁর চোখে পড়ল। তিনি সাবধানে সংসারের হাল ধরে সংসার চালাতে লাগলেন। ওদিকে আবার শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবারও এতটুকু ত্রুটি নেই। ফলে শ্বশুর-শাশুড়ী দুজনেই অল্পদিনে তাঁর প্রতি খুব খুশী হয়ে উঠলেন। শাশুড়ী বুঝলেন—এতদিনে সত্যি তাঁর সংসারে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হয়েছে। অহল্যার বুদ্ধি দেখে শ্বশুরও রাজকর্মে পর্যন্ত তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতে লাগলেন।

ইন্দোরের রাজ-পরিবার আনন্দময় হয়ে উঠল।

এত সুখ অহল্যার ভাগ্যে সইল না। ন' বছর বয়সে অহল্যার বিয়ে হয়েছিল—আর, আরো ন' বছর পরেই অহল্যা বিধবা হলেন। কুমার খাণ্ডে রাও

জাঠদের বিরুদ্ধে গেলেন যুদ্ধ করতে, সেখানেই তাঁর মৃত্যু হল। তখন অহল্যার এক পুত্র আর এক কন্যা বর্তমান।

স্বামীর মৃত্যুতে অহল্যাবাঈ একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। তিনি স্বামীর চিতায় পুড়ে মরবেন, স্থির করলেন। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ীর অনুরোধে এবং নিজের ছোট ছেলেমেয়ে দুটির কথা মনে করে শেষ পর্যন্ত অহল্যার আর মরা হল না।

নানাকাজে জড়িয়ে থাকলে স্বামীর দুঃখ অনেকটা ভুলতে পারবেন, এই বিবেচনা করে মহারাজ কিছু কিছু রাজকার্যের ভারও তুলে দিলেন বিধবা অহল্যাবাঈ-এর হাতে। অহল্যাও বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই তাঁর কাজ করে যেতে লাগলেন।

এমনি ভাবে কেটে গেল আরো বারো বছর। শ্বশুরের দেখে দেখে অহল্যাবাঈ রাজ্যচালনার সমস্ত বিষয়ই বেশ ভালো ভাবে শিখে নিলেন। এমন সময় মলহর রাও হোলকারেরও মৃত্যু হল।

অহল্যাবাঈ-এর পুত্র মালে রাও তখনও ছেলেমানুষ—কাজেই রাজ্যের সমস্ত ভারই এসে পড়ল অহল্যাবাঈ-এর উপর। পূর্বেই তিনি এ বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন—কাজেই রাজ্যশাসন-বিষয়ে তাঁর খুব অসুবিধে হল না।

এদিকে পুত্র মালে রাওকে নিয়ে অহল্যাবাঈ মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন। যতই দিন যেতে লাগল, সে দিন দিন ততই নিষ্ঠুর ও দুর্দান্ত হয়ে উঠতে লাগল।

অহল্যাবাঈ ছেলেবেলা থেকেই দানধর্ম করতে ভালোবাসতেন। রানী হবার পর থেকে, বিশেষ বিধবা হবার পর থেকে তাঁর পূজা-অর্চনা এবং দানের পরিমাণ খুব বেড়ে উঠল। মালে রাও-এর কাছে কিন্তু এসমস্ত মোটেই ভালো লাগত না। মাকে সে নিষেধ করতে পারত না, তাই গোপনে ভিখারী আর ব্রাহ্মণদের জ্বালিয়ে মারত।

দিনে দিনে মালে রাও এত অত্যাচারী হয়ে উঠল যে, পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে অহল্যাবাঈ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

কিন্তু শীঘ্রই তাঁর চিন্তা চিরকালের জন্যে ঘুচে গেল। মালে রাও এক শিল্পীর হত্যার কারণ হয়। মরবার আগে শিল্পী মালে রাওকে অভিশাপ দেয়। তখন থেকেই তার চোখের সামনে বিভীষিকা ভাসতে থাকে। এই থেকেই মালে রাও পাগল হয়ে যায় এবং কিছুদিন পরেই তার মৃত্যু হয়।

সংসারে অহল্যার আর আপনজন বলতে কেউ রইল না। শ্বশুর নেই, স্বামী নেই, পুত্র নেই—অথচ প্রচুর অর্থের মালিক তিনি। চারদিকে লোভীর দল ওৎ পেতে রইল। তাদের মধ্যে রাঘোবা দাদা নামে এক ব্রাহ্মণের আর তর সইল না। সে অহল্যাকে ভয় দেখিয়ে টাকার দাবি করে চিঠি দিল। অহল্যাও তার জবাবে লিখলেন যে, ভিখারীর বেশে তাঁর সামনে এসে হাত পাতলে তিনি কিছু টাকা দিতে পারেন।

এ কথা শুনেই রাঘোবা দাদা চটে গিয়ে বলল—যুদ্ধ করব।

অহল্যাও যুদ্ধের জন্য তৈরী হলেন। তিনি নিজেও সাজলেন যোদ্ধাদের সঙ্গে। তীরধনুক হাতে নিয়ে তিনি সৈন্যদল পরিচালনা করলেন। রাঘোবা দাদা ব্যাপার সুবিধার নয় বুঝে যুদ্ধ না করেই পালিয়ে গেল।

এর পর দানধ্যান আর রাজ্যশাসন ব্যাপারে আবার মন দিলেন অহল্যাবাঈ।

রাজ্যশাসন ব্যাপারে তিনি খুব সংযত ছিলেন। তাঁর মনে কোন লোভ ছিল না। একটি ঘটনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়।

একবার এক বণিকের স্ত্রী পোষ্য গ্রহণ করতে চাইলে এক রাজকর্মচারী তার কাছে রাজ-তহবিলের জন্য তিন লক্ষ টাকা চাইলেন। কর্মচারীটি ভেবেছিলেন যে এতে যদি এমনি কিছু টাকা এসে যায় তবে অহল্যাবাঈ নিশ্চয়ই খুব খুশী হবেন। অহল্যাবাঈ কিন্তু একথা শুনে অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন, বণিকের স্ত্রী যদি শাস্ত্রমতে পোষ্য গ্রহণ করতে চায়, তবে তাঁর আপত্তি করবার কিছু নেই।

অন্যায়ভাবে অপরকে শোষণ করে টাকা আদায় করা অহল্যাবাঈ মোটেই পছন্দ করতেন না।

রাজ্যশাসন ব্যাপারে অহল্যার যথেষ্ট নাম থাকলেও তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়, তাঁর দানে। রাজ্যের খরচ বাদ দিয়ে তাঁর যে টাকা বাঁচত, সেই টাকা তিনি দেবমন্দির নির্মাণ, পথ-ঘাট তৈরী, পুকুর আর দীঘি খনন, অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা, অন্নসত্র স্থাপন ইত্যাদিতেই ব্যয় করতেন।

কাশীর প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথের মন্দির এবং গয়ার বিষ্ণুপাদপদ্মের মন্দির তিনিই তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়া পুরী যাবার এক রাস্তাও তিনি তৈরি করিয়েছিলেন।

তীর্থ ভ্রমণে যাবার সময় তাঁর সঙ্গে অনেক রকম গাছের বীজ থাকত। রাস্তার ধারে ধারে এবং ফাঁকা মাঠে তিনি ঐ সমস্ত বীজ বুনে দিতেন গাছ জন্মাবার জন্যে।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি অনেক অন্নসত্র খুলেছিলেন—তাতে প্রত্যহ হাজার হাজার লোক পেট পুরে খেতে পেত। রানী অহল্যাবাঈয়ের মোট দানের পরিমাণ প্রায় বিশ কোটি টাকা।

ষাটবছর বয়সে তাঁর পোষ্যপুত্র তুকাজী হোলকারের হাতে রাজ্যভার দিয়ে অহল্যাবাঈ দেহত্যাগ করেন।

লক্ষ্মীবাঈ

মারাঠাদেশে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন—তাঁর নাম মোরো পন্ত। মোরো পন্তের স্ত্রী ভাগীরথীবাঈ। তাঁদের কোন সন্তান নেই—কাজেই সংসারের প্রতি টানও নেই। তাই ধর্ম কর্ম করবার জন্যে তাঁরা তুজনেই চলে এলেন কাশীতে।

সেখানেই তাঁদের দিন যায় ধর্মে কর্মে। পুণ্যফলেই হোক আর ভগবতীর

দয়ায়ই হোক—কাশীতে ভাগীরথীবাঈয়ের এক মেয়ে হল। অপূর্ব সুন্দরী সেই মেয়ে—তার রূপের আলোয় যেন ঘর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

দিনে দিনে সেই মেয়ে বড় হতে লাগল। মোরো পন্ত তার নাম রাখলেন মনুবাঈ।

একলা ঘরের মেয়ে মনুবাঈ—ভাই নেই, বোন নেই। নিজের মনেই খেলা করে। কখন মেয়েদের মতো পুতুল খেলা করে, কখন আবার ছেলেদের মতো কাছা দিয়ে কাপড় পরে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করে।

মেয়ে আরো বড়ো হয়েছে—মোরো পন্ত তার জন্যে পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন।

তখন ঝাঁসির রাজা গঙ্গাধর রাও। গঙ্গাধর রাওয়ের স্ত্রী মারা গেছেন, কোন সন্তান নেই তাঁর। কাজেই রাজা ঘোষণা করলেন, তিনি আবার বিয়ে করবেন। কিন্তু যাকে তিনি বিয়ে করবেন, সে অপূর্ব সুন্দরী হওয়া চাই—গরিবের ঘরের হোক, তাতে কোন ক্ষতি নেই।

চারিদিকে লোক বেরুল গঙ্গাধর রাওয়ের জন্যে পাত্রী খুঁজতে। শেষটায় মনের মতো পাত্রী পাওয়া গেল কাশীতে—মেয়েটি মোরো পন্তের কুঁড়ে ঘর আলো করে আছে।

শুভদিনে শুভক্ষণে গঙ্গাধর রাওয়ের সঙ্গে মনুবাঈয়ের বিয়ে হয়ে গেল। মনুবাঈয়ের আগমনে ঝাঁসির রাজপুরীতে যেন লক্ষ্মীশ্রী ফিরে এল—তখন থেকে মনুবাঈয়ের নাম হল লক্ষ্মীবাঈ।

লক্ষ্মীবাঈ লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না, কিন্তু বুদ্ধি ছিল খুব। বুদ্ধির গুণে আর তাঁর আচার-আচরণে সবাই খুব খুশী।

অল্পদিন পরেই লক্ষ্মীবাঈয়ের কোলে এল এক ছেলে—সারা রাজ্যে যেন আনন্দের বান ডাকল। কিন্তু বেশীদিন সইল না সেই সুখ—রাজপুত্র অকালেই প্রাণ হারাল।

গঙ্গাধর রাও একে বুড়ো হয়েছিলেন—তার উপর এই পুত্রশোক সহ্য করতে পারলেন না। লক্ষ্মীবাঈয়ের বয়স যখন আঠারো তখনই গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যু হল।

অকাল-বিধবা লক্ষ্মীবাঈয়ের ঘাড়ে পড়ল বিষম দায়িত্ব। একে গরিবের ঘরের মেয়ে, তায় এতো অল্প বয়স—অথচ বইতে হচ্ছে একটা রাজ্যের বোঝা। মনে মনে ভগবানের নাম করেন, আর নিজের বিচার-বুদ্ধি দিয়ে রাজ্য শাসন করেন।

কিন্তু তাও বুঝি আর হয় না! পথে ইংরেজ সরকার এক বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াল।

গঙ্গাধর রাও মৃত্যুর আগে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেছিলেন। সেই পুত্রের নাম দামোদর রাও। লক্ষ্মীবাঈ দামোদর রাওয়ের নামেই রাজ্য শাসন করছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার লক্ষ্মীবাঈকে বলে পাঠালেন যে তাঁরা দামোদর রাওকে দত্তক বলে স্বীকার করেন না। আর ঝাঁসি স্বাধীন নয়—কাজেই রাজাহীন ঝাঁসির ভার ইংরেজ সরকার নিজের হাতেই তুলে নেবেন। তবে রাণীর সম্মানস্বরূপ মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে রাণীকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

রাণীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল! স্বামী গেছেন, কোলের ছেলে গেছে—রাজ্যও বুঝি যায়! তিনি আপীল করলেন—কিন্তু তা নামঞ্জুর হল। ইংরেজ সরকার বলে পাঠালেন লক্ষ্মীবাঈকে :

ঝাঁসি ফিরিয়ে দাও।

তখনই বলে পাঠালেন লক্ষ্মীবাঈ :

মেরি ঝাঁসি দেংগী নেহি—আমার ঝাঁসি দেব না।

চারিদিকে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

এদিকে তখন দেশের চারদিকে সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়ে উঠে ইংরেজদের ধরে ধরে কাটতে লাগল। সেই বিদ্রোহের ঢেউ এসে লাগল ঝাঁসিতেও। সিপাহীদের ভয়ে অনেক ইংরেজ মহিলা ঝাঁসিতে এসে আশ্রয় চাইলেন লক্ষ্মীবাঈয়ের কাছে।

লক্ষ্মীবাঈ তাঁদের আশ্রয় দিলেন। বিদ্রোহীরা লক্ষ্মীবাঈকে খবর পাঠাল—যদি তাদের টাকা দিয়ে সাহায্য করা না হয়, তবে তারা জোর করে রাজ্য দখল করবে। বাধ্য হয়ে লক্ষ্মীবাঈ তাদেরও সাহায্য করলেন।

ইংরেজ সরকার কিন্তু মনে করলেন যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে লক্ষ্মীবাঈয়েরও যোগ আছে। কিন্তু তাহলেও তাঁরা এখন ভয়ানক ব্যতিব্যস্ত—কাজেই তখন আর কিছু বললেন না। লক্ষ্মীবাঈই আগের মত রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

এদিকে সদাশিব নামে এক ব্যক্তি ঝাঁসির সিংহাসনের দিকে লোভ করে ঝাঁসির একটা কেল্লা দখল করে নিজেকে ঝাঁসির রাজা বলে ঘোষণা করল।

খবর পেয়ে ঝাঁসির রাণী সৈন্যদল পাঠালেন—সদাশিব পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল।

ওদিকে আবার বোরছার রাণী দাবী করে বসলেন ঝাঁসি রাজ্য ;—এককালে নাকি ঝাঁসি তাঁদেরই ছিল। বোরছার রাণীর বিরাট সৈন্যদল নিয়ে নথে খাঁ ঝাঁসি আক্রমণ করলেন।

দেশের লোকের উৎসাহ পেয়ে ঝাঁসির রাণীও সৈন্যদল সাজিয়ে বাধা দিতে তৈরী হলেন। রমণীর বীরত্বের কাছে পুরুষের বীরত্ব হার মানল। বোরছা-পক্ষ পরাজিত হয়ে সন্ধি করল।

ইংরেজরা ছিলেন সুযোগের অপেক্ষায়—সুযোগ বুঝে একদিন ইংরেজ সৈন্য ঝাঁসি আক্রমণ করল। রাণী নিজের হাতে অস্ত্রধারণ করে ইংরেজ সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। কখন ঝাঁসির বাহিনীর গোলার আঘাতে ইংরেজ সৈন্য পিছিয়ে পড়ে, কখন বা আবার নতুন সৈন্যদল নিয়ে তারা এগিয়ে আসে।

আট দিনের দিন বিশহাজার নতুন সৈন্য এসে ঝাঁসির দলের শক্তি বাড়িয়ে তুলল—তার উপর এসে যোগ দিলেন সিপাহী বিদ্রোহের বিখ্যাত নায়ক নানা-

সাহেব আর তাঁতিয়া তোপীর সৈন্যদল। ইংরেজ সৈন্য বিব্রত হয়ে পড়ল, এগারো দিনের দিন ইংরেজ সৈন্য এক কৌশল অবলম্বন করল। আর তারই ফলে ঝাঁসি-পক্ষ পরাজিত হল। নানাসাহেব আর তাঁতিয়া তোপীর সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্রে যে অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ ফেলে গিয়েছিল, তা হস্তগত করে ইংরেজরা তাদের শক্তি আরো বাড়িয়ে তুলল।

ঝাঁসির প্রধান দুর্গ তখনও লক্ষ্মীবাঈয়ের হাতে—ইংরেজরা তোড়জোড় করছে শেষ আঘাত হানবার জন্যে। ঝাঁসির সৈন্যদলও হতাশ হয়ে পড়েছে। লক্ষ্মীবাঈ নিজে তখন তাদের উৎসাহিত করে তুলতে চেষ্টা করলেন।

সৈন্যরা উৎসাহিত হয়ে আবার যুদ্ধ আরম্ভ করল। কিন্তু ইংরেজের গোলার সামনে তারা টিকে থাকতে পারল না। ইংরেজরা রাজবাড়ি দখল করল—শহর লুট করতে লাগল।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ দেখলেন—এবার ধরা পড়তে হবে। ভাবলেন—ইংরেজের হাতে পড়ার চেয়ে আত্মহত্যা করে মরা ভাল। কিন্তু শেষে স্থির করলেন যে, আত্মহত্যা না করে পালিয়ে যাবেন। বাইরে গিয়ে রাজ্য উদ্ধারের জন্য তবু কিছুটা চেষ্টা করা সম্ভব হবে।

তাই হল। যোদ্ধার বেশে ঘোড়ায় চড়ে ইংরেজ সৈন্যের চোখে ধুলি দিয়ে লক্ষ্মীবাঈ রাজ্য ছেড়ে পালালেন।

ঘুরতে ঘুরতে তিনি এলেন নানাসাহেবের ভাইয়ের বাড়িতে। তারপর তাঁর সঙ্গে যুক্তি করে এবং তাঁর সাহায্য নিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইংরেজ সৈন্যের উপর। ঘোড়ায় চড়ে তিনি নিজে গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। তাঁর বীরত্ব দেখে ইংরেজ সেনাপতি স্যার হিউ রোজ বলেছিলেন :

লক্ষ্মীবাঈ মেয়ে হলেও বিপক্ষ দলের মধ্যে তিনিই সকলের চেয়ে বেশী সাহসী ও রণ-নিপুণ ছিলেন।

পেশোয়ার সঙ্গে পরামর্শ করে লক্ষ্মীবাঈ গিয়েছিলেন গোয়ালিয়র রাজ্যে—

তাদের কাছে সাহায্য চাইবার জন্যে। কিন্তু গোয়ালিয়রের রাজা সাহায্য করতে রাজী হলেন না। তখন পেশোয়া গোয়ালিয়রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। লক্ষ্মীবাঈও সেই যুদ্ধে যোগ দিলেন এবং পেশোয়া-পক্ষই যুদ্ধে জয়ী হল।

ইংরেজ সৈন্য এই সংবাদ পেয়ে গোয়ালিয়রে ধেয়ে এল। আবার দুই পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হল। এই যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যের হাতে লক্ষ্মীবাঈয়ের মৃত্যু হল। কেউ কেউ বলেন—তাঁর নিজের দলেরই এক সৈন্য তার গলার রত্নহারের লোভে তাঁকে হত্যা করে।

একশো বছর আগে লক্ষ্মীবাঈয়ের মৃত্যু হয়েছে—কিন্তু দেশের লোক আজও তাঁকে ভুলতে পারে নি।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি—তার পুরোহিতের নাম গদাধর। গদাধর ছিল পাগলাটে প্রকৃতির। কালীপূজা করতে বসে পুরোহিত মায়ের পায়ে ফুল না দিয়ে নিজের মাথায় ফুল দিয়ে বসে থাকে। তা যখন মন্দিরের কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ল, তখন তাঁরা ঐ পাগলা পুরোহিতকে তাড়িয়ে দিলেন।

যে রাণী ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি তখন তীর্থে বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে যখন তিনি শুনলেন যে ঐ পাগলা পুরোহিতকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি লোক পাঠিয়ে আবার তাঁকে ডেকে আনলেন। ঐ পাগলা পুরোহিতই পরবর্তী কালে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। আর ঐ রাণীই হলেন—রাণী রাসমণি।

রাণী রাসমণিই দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সেখানে রামকৃষ্ণকে পুরোহিত নিযুক্ত করেছিলেন। আজ দক্ষিণেশ্বর, রামকৃষ্ণ আর রাণী রাসমণির নাম সারা পৃথিবীর লোক জানে। ইওরোপ-আমেরিকা থেকেও প্রতি বছর বহু লোক আসে রাণী রাসমণির কীর্তি আর রামকৃষ্ণের সাধন-স্থান দক্ষিণেশ্বর দেখতে। অথচ রাণী রাসমণি ছিলেন অতি সাধারণ ঘরের এক বাঙ্গালী মেয়ে।

চব্বিশ পরগনা জেলার হালিশহরের কাছাকাছি এক গ্রামে হরেকৃষ্ণ দাস নামে এক দরিদ্র ব্যক্তি বাস করতেন। তাঁর এক মেয়ে—দেখতে বড় সুন্দরী, তাই বাপ-মা আদর করে তাকে ডাকতেন 'রাণী' বলে। খুব গরিবের ঘরের মেয়ে—তাই তার 'রাণী' নাম শুনে লোকে ঠাট্টা করে বলত—কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। রাণীর বাপ-মা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে তাঁদের আদরের রাণী সত্যি একজন 'রাণী' হয়ে উঠবে। অথচ দরিদ্র হরেকৃষ্ণ দাসের এই মেয়েই পরবর্তী কালের রাণী রাসমণি।

এগারো বছর বয়সে রাসমণির বিয়ে হয় রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে। রাজচন্দ্র দাস ছিলেন এক ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র—তার পূর্বপুরুষেরা বাঁশের ব্যবসা করতেন। রাসমণির বিয়ের আগে তাঁর শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভালো থাকলেও বিয়ের পর থেকেই যেন ধনদৌলত একেবারে উপচে পড়তে লাগল। রাসমণি যেন লক্ষ্মীরূপেই তাঁদের ঘরে বধূ হয়ে এলেন।

রাসমণির বিয়ের প্রায় বত্রিশ বছর পর তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুতে রাসমণি শোকে অবসন্ন হয়ে পড়লেও তাঁকে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে

হল। কারণ তা নইলে স্বামী যে বিরাট সম্পত্তি রেখে গেছেন, তা নষ্ট হয়ে যাবে। রাসমণি যখন স্বামীর সম্পত্তির ভার গ্রহণ করলেন, তখন তার পরিমাণ নগদ প্রায় কোটি টাকা, আর তা ছাড়া ছিল বিরাট জমিদারি। নিজের বুদ্ধি এবং ক্ষমতার গুণে রাসমণি স্বামীর সম্পত্তি বহুগুণে বাড়িয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর তিন জামাতা।

রাসমণির কোন পুত্র-সন্তান ছিল না—ছিল তিন কন্যা। তিন কন্যার বিয়ে দিয়ে জামাতাদের তিনি নিজের কাছেই রেখেছিলেন।

রাসমণি দরিদ্রের ঘরে জন্মেছিলেন—তাই গরিবের দুঃখ তিনি কোনদিন ভোলেন নি। যখন তিনি বিরাট সম্পত্তির অধিকারী হলেন, তখনও তাদের কথা মনে ছিল। যখনই সুযোগ পেয়েছেন, তখনই তিনি দরিদ্রের সহায়তা করেছেন ; দুঃখে পড়ে যে তাঁর সাহায্য চেয়েছে, অকাতরে তাকে সাহায্য করেছেন।

গঙ্গায় জেলেরা বিনা খাজনায় মাছ ধরত। একবার ইংরেজ সরকার তাদের উপর খাজনা চাপালেন। গরিব বেচারীরা এমনিতেই খেতে পায় না—তার উপর খাজনা দেওয়া কি করে সম্ভব ? তখন তারা গিয়ে পড়ল রাণী রাসমণির কাছে—তাঁকে এর একটা উপায় করে দিতে হবে। রাসমণি সব শুনে বললেন—আচ্ছা, তোমরা যাও। দেখি কি করতে পারি।

তারপর তিনি ইংরেজদের অনেক টাকা দিয়ে গঙ্গা ইজারা নিলেন এবং গঙ্গা-বরাবর এক লোহার শিকল টানালেন। এতে ষ্টীমার, লঞ্চ প্রভৃতি চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। ইংরেজরা এসে রাসমণিকে শিকল তুলে নিতে বলল। রাসমণি বললেন :

'তা আমি কি করব। এত টাকায় ইজারা নিয়েছি, মাছ ধরে তা উসুল করব। তোমাদের ষ্টীমার আর লঞ্চের শব্দে মাছ পালিয়ে যায়—তাই শিকল টানিয়েছি।'

ইংরেজরা জব্দ হয়ে জেলেদের কাছ থেকে খাজনা নেওয়ার হুকুম তুলে নিল—

রাণী রাসমণিও শিকল তুলে ফেললেন। জেলেরা মহা খুশী, তারা আবার বিনা খাজনায় গঙ্গায় মাছ ধরতে লাগল।

জনসাধারণের দুঃখে যে তাঁর প্রাণ কত কাঁদত, এ থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইংরেজ-রাজত্বে বাস করেও রাণী রাসমণি যে স্বাধীন বুদ্ধির ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, এ ঘটনা ছাড়া অন্য ঘটনায়ও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাণী রাসমণির স্বামী রাজচন্দ্র দাস কলিকাতা হাইকোর্টের নিকটেই গঙ্গায় একটি পাকা ঘাট তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে সাধারণ লোকেদের স্নানের খুব সুবিধে হয়েছিল। একবার রাণী রাসমণির বাড়ির কোন ব্যাপার উপলক্ষে বাড়ির লোকেরা বাদ্যিবাজনা নিয়ে গঙ্গার সেই ঘাটের দিকে যাচ্ছিল। এই বাদ্যিবাজনা শুনে পথের দুধারে যে সমস্ত সাহেব বাস করতেন, তাঁরা আপত্তি জানালেন। তাঁরা এই হই-চই বাদ্যিবাজনা বন্ধ করবার জন্যে রাণীর বিরুদ্ধে সরকারের নিকট নালিশ করলেন। এ খবর রাণী রাসমণির কানে উঠল। তিনি পরদিন বাদ্যি-বাজনা সহ আরো বেশী লোকজন পাঠিয়ে দিলেন সেই ঘাটে। সাহেবরা বুঝতে পারলেন, তাঁরা নালিশ করেছেন বলেই রাণী আরো বেশী বেশী গোলযোগ করাচ্ছেন। তাঁরা সরকারের নিকট আবার নালিশ জানালেন। ফলে মামলা হল এবং মামলায় রাণী রাসমণি হেরে গেলেন। রাণীকে শাস্তিস্বরূপ জরিমানা দিতে হল।

রাণী কিন্তু এই অপমান নীরবে সহ্য করলেন না—তিনি ঐদিনই বেড়া দিয়ে গঙ্গার ঘাটের পথ বন্ধ করে দিলেন। ফলে সাহেবদের গাড়িঘোড়া চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। তাঁরা আবার সরকারের নিকট নালিশ করলেন। সরকার পক্ষ থেকে লোক এসে রাণীর নিকট অনুরোধ জানানো হল—বেড়া তুলে দেবার জন্যে।

রাণী বললেন :

'আমার খুশিমত তো আমি রাস্তা তৈরি করেছি, আমার খুশি, আমি তা বন্ধ করে দেব। তাতে অন্যের সুবিধে হল, কি অসুবিধে হল, তা আমার দেখবার কথা নয়।'

ফলে সরকার থেকে মাপ চেয়ে জরিমানার টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হল, রাণী রাসমণিও রাস্তার বেড়া তুলে দিলেন।

ছেলেবেলা থেকেই রাসমণির মনে ছিল ধর্মভাব। বড় হয়ে যখন সুযোগ পেলেন, তখন রাণী ধর্ম-আচরণের কোন সুযোগই অবহেলা করেন নি। তাঁর বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব থেকে আরম্ভ করে কোন অনুষ্ঠানই বাদ যেত না। পূজাপার্বণ উপলক্ষে তাঁর বাড়িতে হাজার হাজার গরিব কাঙাল পেট পুরে খাবার পেত। তাছাড়া আত্মীয়-অনাত্মীয়, পাড়াপ্রতিবেশীরাও আপদে বিপদে তাঁর কাছ থেকে নানা ভাবে সাহায্য পেয়েছে। তাঁর সম্পত্তির আয় যতই বেড়ে উঠেছে, দানের পরিমাণও তিনি ততই বাড়িয়ে দিয়েছেন।

রাণী রাসমণি ভারতের বহু তীর্থ ঘুরে সব জায়গাতেই যথেষ্ট দান করে এসেছেন। তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য তিনি পুরী যাবার এক সুন্দর রাস্তা তৈরি করে দেন। পুরীর জগন্নাথ, বলরাম, আর সুভদ্রার মুকুট তিনিই গড়িয়ে দিয়েছিলেন।

রাণী রাসমণির সবচেয়ে বড় কীর্তি—দক্ষিণেশ্বরের মন্দির স্থাপন। একবার তিনি স্বপ্নাদেশ পেলেন কালীমূর্তি, রাধাশ্যামের যুগলমূর্তি আর দ্বাদশটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে মন্দির গড়ে দেবার জন্যে। তারপর থেকেই তিনি গঙ্গার ধারে ধারে উপযুক্ত স্থান খুঁজতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরই তাঁর পছন্দ হলো, এবং সেখানে কালী, রাধাকৃষ্ণ এবং দ্বাদশ শিবের মন্দির স্থাপন করে দেবতার প্রতিষ্ঠা করলেন।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই দক্ষিণেশ্বরেই পঞ্চবটী বনে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। বর্তমান কালে দক্ষিণেশ্বর ভারতবাসীর এক অন্যতম প্রধান তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরগুলির ভোগে ও পূজায় যাতে কোন বাধা উপস্থিত না হয়, তার জন্যে তিনি ষাট হাজার টাকার সম্পত্তি দেবোত্তর করে রেখে যান। তাঁর এই কীর্তির জন্য দেশবাসী তাঁকে চিরকাল মনে রাখবে।

প্রায় ৬৭ বৎসর বয়সে পুণ্যশীলা রাণী রাসমণির মৃত্যু হয়।

সমাপ্ত

জনশিক্ষা গ্রন্থমালা

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ, কলিঃ-৯